চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ

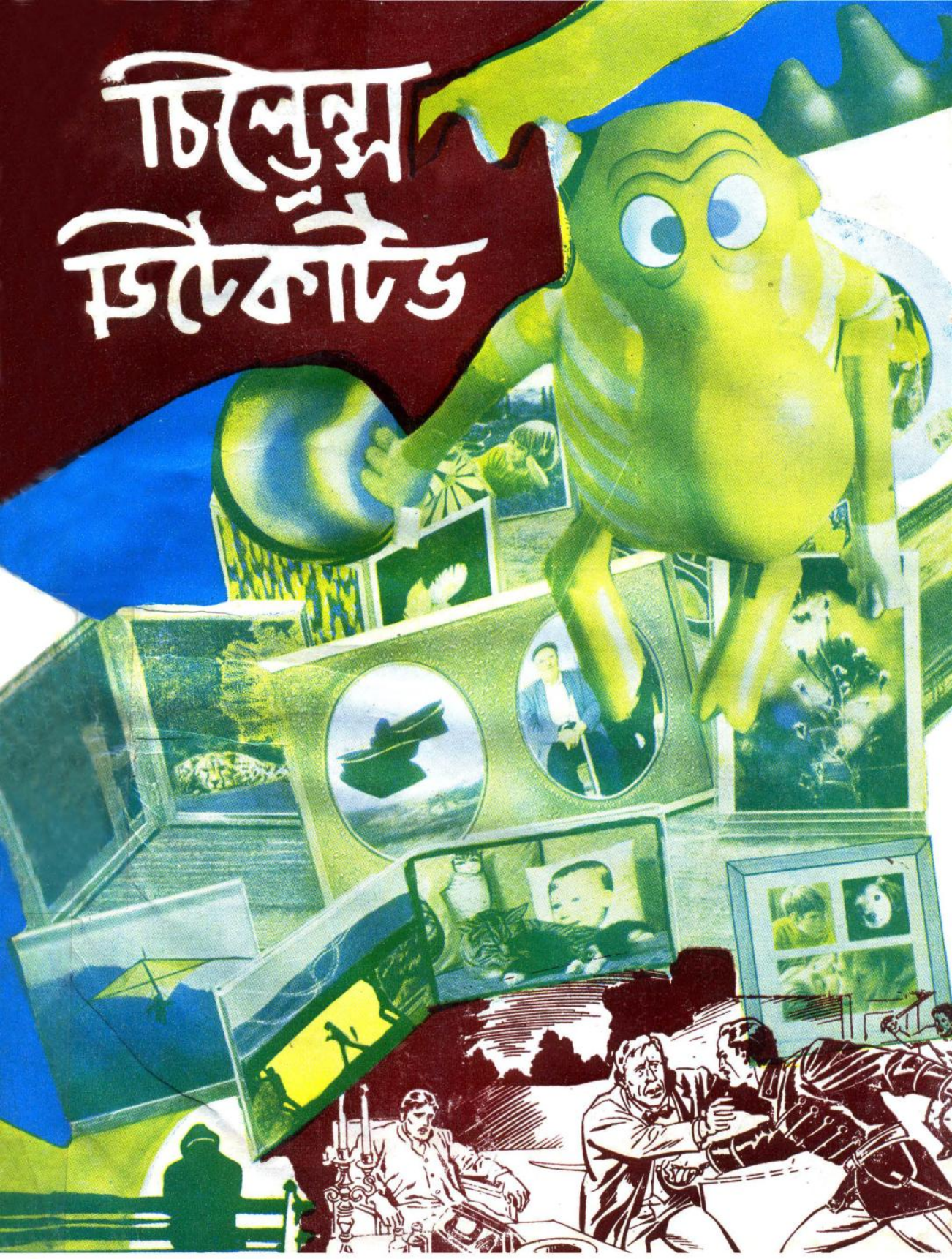

Hard Copy & Scan - Debasish Roy
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

OASIS contains Ayurvedic approved ingredients such as Bhringraj, Ghrita Kumari, Somraj. Kesut, Hasti Danta Churna Mucilage, Egg Yolk, Amlaki, Lemon, Purified Water. According to Ayurvedic Sastras the ingredients used in **OASIS** help to stop falling of hair. It also helps to keep brain cool and to grow fresh hair. Even herbs can clean dandruff. More details inside the phial.

Try compare the characteristic of OASIS And watch how it performs Ayurved Sastra & OASIS

Ask any medical, stationary departmental Stores for this lotion.

MARKETED BY
CALCUTTA FILMLET ADVERTISING
(MARKETING DIVISION)

BOMBAY • CALCUTTA • PATNA
• CUTTACK Tinkunia Bagicha Cuttack-1
• KANPUR 96/12, The Mall, P. P. N Market 1st Floor, Kanpur 208001

A product of Herbal Research Institute.

Test OASIS
to believe it at our free application centre

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ

ঐতিহাসিক সংখ্যা

অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী

ছোট্ট বন্ধুরা,

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের ভাদ্র সংখ্যা প্রকাশিত হল। এবারের 'উপহার' বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী 'প্রিজনার অফ জেণ্ডা'। সেই সঙ্গে আছে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী। নিয়মিত ফিচারগুলি অবশ্যই আছে।

পূজায় তোমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে। আমাদের শুভানুধ্যায়ী নাম করা সব লেখক লেখিকাই সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া থাকবে পাতায় পাতায় ছবি, নানা স্বাদের নানা ধরনের একাধিক উপন্যাস—যেগুলি পড়তে বসলে শেষ না করে উঠতে পারবে না। কমিক্‌স তো থাকবেই। তোমাদের কাগজওয়ালাকে এখন থেকেই বলে রাখো—'পূজা সংখ্যা চাই-ই-চাই।' মহালয়ার অনেক আগেই পূজা সংখ্যা তোমাদের হাতে পৌঁছে যাবে।

১৬ই অগস্ট, ১৯৮২ — ***অমিতাভ সেন***

প্রধান সম্পাদক

ভিতরের ছাপায় সহযোগিতা :
ইম্প্রেশন, কলিকাতা ৬, জয়শ্রী প্রেস, কলিকাতা
প্রচ্ছদ ছাপা : নিউগয়া আর্ট প্রেস, কলিকাতা ৯
ব্লক করেছেন : রয়েল হাফটোন, কলিকাতা ৭

সোহিনী প্রকাশনী ২৬ স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা ৬
দাম—২ টাকা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকার কর্তৃক মনোনীত কিশোরদের পাঠ্য

সূচীপত্র

রহস্য উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ বাদশাহী মোহর ৫
ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঘোড়া কিনলেন কলিন্স সাহেব ৫৯
রাধারমণ রায় ॥ মুক্তি পেলেন হিউয়েন সাঙ ৮১
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নিশীথ রাতে টুটুল ৭৮
অমিতাভ সেন ॥ গুপ্তধন রহস্য ১১

বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী

দি ফার্স্ট ভয়েজ অফ ক্রিস্টোফর কলম্বাস
ডঃ রবীন্দ্র নাথ বসু ৬৭

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাহিনী

দ্য প্রিজনার অফ জেণ্ডা
ডঃ সুপ্তি সেন ১৯

প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় : বয়স চোদ্দ

পুষ্পেন্দু নারায়ণ লাহিড়ী ॥ বিষ্ণুদাস ৬৩
দীপেন্দ্র মুখার্জী ॥ প্রতিশোধ ৬৫
সোহিনী পাল ॥ জানো কি ? ৬৬
টারজান কমিক্স ॥ ফাঁদ (৭) ৯
কমিক্স সিরিজ ॥ বিষাক্ত ওষুধ রহস্য (৯) ১০

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের

পূজা সংখ্যার আকর্ষণ

তোমাদের জন্য বাছা বাছা বিশ্বের সেরা ২টি কাহিনী

গত বছরের সব লেখক/লেখিকারাতো লিখেছেনই,

এছাড়া আরও আকর্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গল্প, ফিচার, ধাঁধাঁ, অ্যাডভেঞ্চার, শিকার ও প্রতিযোগিতার খবর পাবে।

কমিকস সিরিজ আকর্ষণের আর একটি বিভাগ

এছাড়াও আকর্ষণীয় প্রতি পৃষ্ঠার গল্পের ছবিতে কথা বলবে।

অন্যান্য রচনা

বিজ্ঞানের প্রশ্নমালা, ক্রসওয়ার্ড, গল্পের মধ্যে ফিলাপ ব্ল্যাঙ্ক

পড়তে বসলে শেষ না করে উঠতে পারবে না তাই আগে থেকেই সবাইকে পূজা সংখ্যা নেবার জন্য বলে রাখো বেরুলেই কিন্তু

'পূজা সংখ্যা চাই-ই চাই'

[**গোড়ার কথা ঃ** বিপ্লবদের পুরোন বাড়ির কোথাও বাদশাহী সোনার মোহর লুকোন আছে। অনেকেই বাড়ি কিনতে চায়। দেড় লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি কিনতে এসে প্রথম খদ্দের দরজার গোড়ায় খুন হ'ল। থানার ওসি ওদের সন্দেহ করছে অনুমান করে বিপ্লব প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিরূপাক্ষ সেনকে নিয়ে এল। থানা থেকে ফেরার পথে কারা বিপ্লবকে কিডন্যাপ করে বেলগাছিয়ার এক বাড়িতে আটকে রাখল। আবার চোরের ওপর বাটপাড়ি—আর একজনেরা বিপ্লবকে কিডন্যাপ করলো। জ্ঞান হতে বিপ্লব দেখে সে বন্দী, পায়ে শেকল, তালা দেওয়া। এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিপ্লবের কথা হচ্ছে। তিনি নাকি বিপ্লবের কাকিমা। বিপ্লবের কাকা বীরেশ্বর রায় পরাশরের পরামর্শে বিপ্লবকে আটকে রেখেছি। বাড়ি বিক্রির দলিলে বিপ্লব সই না করলে, পরাশর বিপ্লবকে খুন করবে। বীরেশ্বর আর পরাশর সেখানে এসে পড়লো। ভদ্রমহিলা ঘর থেকে যাবেন না। বীরেশ্বর শাসায় তার স্ত্রীকে খুন করবে বলে।]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মাধবী দেবী এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, করো, করো, তুমি আমাকে খুনই করো—
—হ্যাঁ—হ্যাঁ খুনই করবো তোকে।

শেরওয়ানী কুর্তা পরা লোকটি এবারে বললে, বীরেশ্বর, তোমার কি মাথা খারাপ হলো, নিজের স্ত্রীকে তুমি খুন করতে পারবে?

—ও সব পারে—টাকার জন্য ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে, পরাশরবাবু; আর সেটা আপনি করাচ্ছেন ওকে দশ হাজার টাকা দিয়ে—সেই দশ হাজার টাকা ওর মনের মধ্যে যে লোভের আগুন জ্বেলে দিয়েছে সেই আগুনেই আজ ও সর্বক্ষণ পুড়ছে—নিজেও পুড়ছে আমাকেও পোড়াচ্ছে—দিন ওকে ছেড়ে দিন, ও আমাকে খুনই করুক।

—শোন বীরেশ্বরবাবু মাথা ঠাণ্ডা করো। এ সময় মাথা গরম করে কোন লাভ হবে না বরং তোমাকে আবার বিপদের মধ্যে পড়তে হবে—তার চাইতে পাশের ঘরে চলো—একটা পরামর্শ করা যাক।

—পরামর্শ?

হ্যাঁ—পরামর্শ। সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্রী রকমের জট পাকিয়ে গিয়েছে—

—সব জট আমি খুলে দেবো। বীরেশ্বর বললে।

—পারবে না—তাড়া হুড়া করে কিছু সুবিধা হবে না। আবার জট পাকিয়ে যাবে। ঐ ছেলেটিই ত বিপ্লব।

—হ্যাঁ—বীরেশ্বর বললে।

—ও এখানেই অমনি করে শিকল বাঁধা থাক—ঐ হবে আমাদের রঙের টেক্কা। রঙের টেক্কা আমাদের হাতে থাকলে আমরা জিতবই—চল পাশের ঘরে চল!

আগুনঝরা দৃষ্টিতে একবার অদূরে দণ্ডায়মানা মাধবী দেবীর দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বর পরাশরের সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

—কাকীমা—

মাধবী দেবী বিপ্লবের মুখের দিকে তাকালেন।

শুনলেনত কাকাবাবুর কথা—আমি মুক্তি চাই না।

—চাও না—

—না।

আমি ওদের মুঠার ভিতর থেকে পালিয়ে গেলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই আপনাকে খুন করবে।

—করুক।

না কাকীমা। আমি তা চাই না। দেখি না ওরা কত দিন আমাকে এভাবে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে।

পরাশরকে তুমি জান না বিপ্লব—নিশ্চয়ই কোন নতুন মতলব ওর মাথায় এসেছে—তাই ও তোমার কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল—কোন নতুন মতলব ওরা ফাঁদবার আগেই তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো।

—তার চেয়ে এক কাজ করুন কাকীমা।

বিরূপাক্ষ সেনকে আপনি একটা খবর দিতে পারবেন কোনমতে যে আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি—বিরূপাক্ষ সেন খবর পেলে আমার মাও জানতে পারবে যে আমি মরিনি আমি বেঁচে আছি।

—কিন্তু কে বিরূপাক্ষ সেন। তাকে ত আমি চিনি না বাবা।

—চেনবার দরকার নেই—১৭।১ তালতলা লেনে থাকেন বিরূপাক্ষবাবু।

—কিন্তু তাকে জানাবো কি করে।

—কাউকে দিয়ে যদি তাকে একটা চিঠি পাঠাতে পারেন।

—কাকে দিয়ে পাঠাবো চিঠি।

—কেউ নেই এমন—যার হাতে একটা চিঠি পাঠান যায়।

—এ বাড়িতে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী—আমি আর আমার বার বছরের ছেলে তারকেশ্বর—তারু।

—ও, তাহলে কি হবে—

—তাইত বলছিলাম তারুও একেবারে ছেলেমানুষ। পাশের ঘরে তখন বীরেশ্বর ও পরাশর দুজনে কথা বলছিল।

—শোন বীরেশ্বর আমি ভেবে দেখলাম—ঐ বিপ্লব ছেলেটিই হবে আমাদের এ খেলায় রঙের টেক্কা।

—কেমন করে।

—ওর মা রত্না দেবীকে ত চিঠি পাঠান হয়েছে—

—হ্যাঁ—রাখাল সামন্তর হাত দিয়ে চিঠি পাঠান হয়েছে—কিন্তু সেওত দুদিন হয়ে গেল, রাখালত এখনো ফিরল না। তাছাড়া ঐ রত্নাদেবীকে আমি বিশ্বাস করি না। সঙ্গে আবার তার এখন একটা ফেউ জুটেছে, খবর পেয়েছি—

—ফেউ!

—হ্যাঁ বীরূপাক্ষ সেন।

—সে আবার কে? পরাশর প্রশ্ন করল।

—গোয়েন্দা—শুনেছি একজন নাম করা গোয়েন্দা।

—গোয়েন্দা আবার কোথা থেকে এলো এর মধ্যে—

—ঐ বিপ্লব লোকটাকে চিনতো সেই তাকে ডেকে এনেছে—না পরাশর আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটা যে এমনি বিশ্রী একটা জট পাকাবে যদি জানতাম তবে এর মধ্যে আমি মাথা গলতাম না।

—তাহলে আশী হাজার টাকা তুমি চাও না বীরেশ্বর—

—ও টাকা বোধ হয় আমার ভাগ্যে নেই—তাছাড়া বাকী টাকাত তুমি দেবে ঐ বাড়ির বিক্রয়-দলিলে সই সাবুত হলে পর—

—তাত নিশ্চই—তুমি ত জান বীরেশ্বর আমার পলিসি হচ্ছে ফেল কড়ি মাখ তেল—নগদা নগদি

—তা সত্ত্বেও তোমাকে আগাম দশ হাজার দিয়েছি আমি, সেটাকাতো তোমার কাছে আছে—

—দশ হাজার টাকা—এ সব বৃহৎ যজ্ঞে ঐ দশ ত যৎসামান্য—মনে কর দেখো এ জন্যেই যতীন খুন হলো—

—কে যে যতীনকে খুন করলো এখনো বুঝতে পারলাম না।

—কে আবার করবে ঐ সুন্দর সিংই খুন করেছে। যতীন মরার আগে যদি কোন জবানবন্দী দিয়ে থাকে আমাদের কথা সব ফাঁস করে দিয়ে থাকে তবেই ত চিত্তির—সকলেরই হাতে দড়ি পড়বে—পরাশর বললে, যতীন যে অমন করে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম—

—যতীনকে তোমার দলে নিয়ে খুব বোকামী করেছো পরাশর—

—বোকামী করেছি।

—নয়—ভেবে দেখো সে তোমার সমস্ত প্ল্যান জানত—তুমি বাড়িটা কেনার চেষ্টা করছো ভাল করেই জানত—তা সত্ত্বেও তোমার অজ্ঞাতে নিজেই ক্রেতা হয়ে গেল রত্নাদেবীর কাছে। শুনেছো বোধ হয় যতীন রত্নাদেবীকে দেড় লাখ টাকা বাড়িটার জন্য অফার করেছিল—

—জানি—কিন্তু অত টাকা সে পেল কোথায় দেড় লাখ টাকা ত কম নয়!

—আমার কি মনে হয় জান পরাশর।

—কি।

—যতীন একা নয়—তার সঙ্গে আরো কেউ আছে—

—কি বলছো বীরেশ্বর।

—ঠিকই বলছি—মনে পড়ে তোমার—আমরা যখন বাড়িটা যাতে তুমি কিনতে পারো বলে প্ল্যান করছি তখন লছমন দাস সিং নামে একজন লোক পাটনা থেকে তোমার কাছে এসেছিল।

—লছমন দাস সিং।

—হ্যাঁ যতীনই তোমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে

দিয়েছিল। লোকটা দালালী করে, বিশেষ করে বাড়ি কেনা বেচার ব্যাপারে। সে তোমাকে বলেছিল আরো কমে সে তোমাকে বাড়িটা কিনিয়ে দিতে পারে—অবিশ্যি ব্রোকারীর জন্য তাকে তোমায় ৫% দিতে হবে।

—হ্যাঁ – হ্যাঁ মনে পড়েছে।

—তুমি লোকটাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলে ?

—তুমি সে কথা জানলে কি করে বীরেশ্বর—

—রাখাল সামন্তই আমাকে খবরটা দিয়েছিল।

—দেখো বীরেশ্বর—কিছু মনে করো না। তোমার ঐ রাখাল সামান্তকে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।

—ভুলে যাচ্ছো পরাশর—ঐ রাখালই আমাকে প্রথম বলে ঐ বাড়িটার মধ্যে আসল সোনার বাদশাহী মোহর পোঁতা আছে। আমি সংবাদটা প্রথম রাখালের কাছেই পাই।

—রাখাল সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত ?

—নিশ্চয়ই হঠাৎ ও কথা কেন ?

—না, তাই বলছি—ও দু পক্ষেই কাজ করছে না ত ?

—না, না—কি বলছো তুমি পরাশর !

—ঠিকই বলছি—রাখাল সম্পর্কে তোমার ভাল করে সন্ধান নেওয়া উচিত ছিল—ওকে তোমার দলে নেবার আগে। যাক, যা বলার জন্য তোমাকে ডেকে এনেছি—

—বল।

—বিপ্লবকে নগদ টাকা দিয়ে দলিলে সই করিয়ে নাও।

—নগদ দোব ?

—হ্যাঁ বিপ্লব দলিলে সই করলে ওর মা রত্না দেবী সই না করে শেষ পর্যন্ত পারবেন না।

—কিন্তু—

—ভাবছো তোমার বাকী টাকার কথা ?

—হ্যাঁ—মানে—

—সে টাকাও তুমি হাতে হাতে পাবে।

—বেশ—তাই তবে হবে। চল বিপ্লবের কাছে।

ঠিক ঐ সময় রাখাল সামন্ত এসে ঘরে ঢুকল। মাথার চুল উস্কো খুস্কো—ছেঁড়া জামা—ময়লা একটা ধুতি পরনে—খালি পা।

—একি রাখাল—কি হয়েছে তোমার ? এ বেশ কেন ?

—বীরূপাক্ষ সেন—কোনমতে রাখাল বললে।

—বীরূপাক্ষ—

—হ্যাঁ—অনেক কষ্টে তার জেরা থেকে পার পেয়ে এসেছি—তারপর সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসতে সাহস হয়নি। এই ছদ্মবেশে দুদিন এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি।

—মানে—তুমি রত্নাদেবীর সঙ্গে দেখা করোনি রাখাল ?

—করেছি ?

—কি বললো রত্না দেবী ?

—সেখানে অগাধ জল।

(ক্রমশঃ)

('বাদশাহী মোহর' আবার পাবে পূজা সংখ্যার পর)

বিমানের পেটের দরজা খুলে ছত্রী সৈন্যরা নীচে লাফিয়ে পড়ল.
সেই সঙ্গে এলো জীপগাড়ী ভারী যন্ত্রপাতি....
একশর বেশী সশস্ত্র লোক তৈরী
হুকুম কি তোমরা জান! যারা বিষাক্ত ওষুধ খায়নি তাদের জোর করে খাওয়াতে হবে।
বৃটিশ সৈন্যদের পোশাকে 'ওয়াম'-এর সৈন্যরা শহরে টহল দিচ্ছে, ঘোষণা করছে.....
সেনাবাহিনীর পক্ষে কথা বলছি। সুস্থ ও সবল সকলেই ট্র্যাফেলগার স্কোয়ারে জড়ো হন!
৭৯
ব্যারাকুডা ও গ্রেগলো ঘোষণা শুনছে
সেনাবাহিনী নেমে পড়েছে। কি হচ্ছে দেখতে

টারজান ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে সামলে নেয়!
জেসকে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ফাঁদে ফেলবে!
আ আ ও!
ওরা বুঝতে পারছে না জেসকে জানাতে হবে!
জানাচ্ছি—ও আ-আ-আ-ও
ও ও!
বাতাসে গরিলার গর্জন... কি বিকট চিৎকার...!
আরে মেয়েটা হাসছে.. ওর বন্যজন্তুকে ভয় নেই!

.....গুপ্তধন রহস্য.....

হাত খানেক গর্ত খোঁড়া হয়েছে। হঠাৎ উল্‌ফ গর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে দুটি নরকঙ্কালের হাড় বেরিয়ে পড়লো। খোন্তা দিয়ে দু'একটা ঘা মারতেই দেখা গেল একটা কঙ্কালের বুকে স্পেন দেশীয় একটা বড় ছোরা বিঁধে রয়েছে। আর একটু মাটি সরাবার পর কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পাওয়া গেল।

স্বর্ণমুদ্রা দেখে জুপিটার লাফাতে শুরু করেছে। লেগ্রাণ্ড কিন্তু খুশী নয়। বললে,আরও গভীরে খুঁড়তে হবে। লেগ্রাণ্ডের কথা শেষ হতে না হতেই, আমার জুতোটা কিসে যেন আটকে গেল, হোঁচট খেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে নজর দিয়ে দেখি, মাটির মধ্যে পোঁতা একটা বেশ বড় লোহার আংটায় পা আটকে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। আংটাটায় মরচে ধরে গেছে, আংটাটার গায়ে মাটি জমে আছে।

উত্তেজনা চরমে উঠেছে। তিনজনে সাবধানে চার পাশের মাটি সরিয়ে দেখতে পেলাম একটা কাঠের সিন্দুক—সাড়ে তিন ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া এবং আড়াই ফুট গভীর। সিন্দুকটার চারপাশ লোহার পাত দিয়ে মোড়া—অবশ্য মরচে ধরে গেছে। ওপরের দিকে দুপাশে তিনটে করে লোহার আংটা, সহজেই হাতে ধরা যায়। এই একটা আংটায় পা বেঁধে আমি হোঁচট খেয়ে ছিলাম। ছ'জন বেশ তাগড়া জোয়ান লোক সিন্দুকটা বয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমরা তিনজন আংটটা ধরে চেষ্টা করেও সিন্দুকটা নাড়াতে পারলাম না।

ওপরের ডালাটা হুড়কো দিয়ে সিন্দুকের সঙ্গে আটকানো ছিল। তালা নেই। হুড়কো সরিয়ে ওপরের

ডালাটা তুলে ধরতেই আমাদের লণ্ঠনের আলোতে সিন্দুক থেকে বিজলির ছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওপরের স্তরের সোনার মোহর আর জহরত থেকে। জুপিটার গর্তের মধ্যে বসে পড়ে কনুই পর্যন্ত তার দুটো হাত সিন্দুকের ভেতর সেঁধিয়ে দিয়ে বিস্ময়ভরা স্বরে বলতে থাকে—ওই সোনা পোকাই এইসব দিয়েছে আমাদের।

সিন্দুক বয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের ক্ষমতার বাইরে। দিনের আলো ফোটবার আগেই সব সরিয়ে ফেলতে হবে, কুটিরের নিরাপদ আশ্রয়ে। পরামর্শ করে ঠিক করলাম, সিন্দুক অর্ধেকের বেশী খালি করে

হালকা করে নিতে হবে। তখন সিন্দুকটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবো। খালাস করা জহরত ওইখানে একটা ঝোপের আড়ালে মাটি ঢাকা দিয়ে উল্‌ফকে পাহারায় রেখে, নৌকো করে সিন্দুকটা নিয়ে আমরা দ্বীপে কুটিরে ফিরে যাব।

সিন্দুকের মধ্যে তিন ভাগের একভাগ রেখে বাকি জিনিস সরাবার পর তিনজনে মিলে সিন্দুকটা গর্ত থেকে তুলতে পারলাম। ঝোপের আড়লে বাকি জিনিস মাটি চাপা দিয়ে উলফকে পাহারায় রেখে সিন্দুক নিয়ে আমরা নৌকোয় উঠে দ্বীপের দিকে রওনা হলাম।

গাঢ় অন্ধকারে নৌকো চালিয়ে রাত একটা নাগাদ লেগ্রাণ্ডের কুটিরে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর রাতের খাওয়া শেষ হতে রাত দুটো বাজল। আর দেরী করা যাবে না। কুটির থেকে তিনটে মজবুত বস্তা নিয়ে আবার রওনা দিলাম, গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য।

রাত চারটে নাগাদ সেই গোপন আস্তানায় পৌঁছলাম। সব ঠিক আছে। উলফ পাহারা দিচ্ছে। জিনিসগুলো সমানভাবে তিনটে বস্তায় ভর্তি করলাম। প্রত্যেকে একটা করে বস্তা কাঁধে তুলে নিলাম। লণ্ঠনের আলোয় খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি, কোথাও কিছু পড়ে নেই। আমাদের পিছনে পিছনে উলফও নৌকোয় এসে উঠল। কাঁধে তিন বস্তা নিয়ে লেগ্রাণ্ডের কুটিরে যখন পৌঁছলাম, তখন পূবদিক ফরসা হয়ে উঠেছে।

একটানা পরিশ্রমে সবাই শ্রান্ত। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। কিন্তু বিশ্রাম করার চিন্তা কারোর মাথায় নেই। কি পেয়েছি তার হিসেব নিতে হবে এখন। সিন্দুকটার ডালা পর্যন্ত সোনা-জহরতে ঠাসা ছিল।

হীরে, জহরত, মণি, মুক্তো, সোনার মুদ্রা সব আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে আমাদের সারাদিন ও প্রায় রাত বারটা পর্যন্ত কাজ করতে হ'ল। এক এক ধরনের জিনিস আলাদা থাক করে রাখলাম—আনুমানিক হিসেব করে দেখলাম, প্রথমে যা আন্দাজ করেছিলাম সম্পদের পরিমাণ তার চেয়ে অন্তত পাঁচগুণ বেশী।

স্বর্ণমুদ্রার ভেতর কোনও মার্কিন মুদ্রা নেই। ইংরেজ, জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা—দাম তখনকার দিনের প্রায় দেড়লক্ষ ডলার। এক একটা স্বর্ণমুদ্রা আবার অন্যগুলির চেয়ে আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ। ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ে গেছে, লেখা পড়া যায় না।

এবার জহরতের হিসাব দেওয়া যাক। বেশ বড় সাইজের হীরা একশ দশটি; বড় চুনি আঠারোটি, তিনশ দশটি পান্না; স্যাফায়ার একুশটি, ওপাল একটি। সবগুলিই জড়োয়া গহনায় বসানো ছিল এক সময়। খুলে নেওয়া হয়েছে। গহনার সোনা পিটিয়ে পাত করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া শুধু সোনা দিয়ে তৈরী—প্রায় দু'শ আংটি ও ইয়াররিং। সোনার চেন, প্রকাণ্ড একটা সোনার পান-পাত্র এবং আরও অনেক কিছু। এগুলিতে যা সোনা আছে, তার ওজন সাড়ে তিনশ' পাউণ্ডের বেশী হবে।

এছাড়া পেলাম একশ সাতানব্বইটি সোনার পকেট ঘড়ি। দীর্ঘ দিন মাটির নীচে পোঁতা ছিল বলে, ঘড়িগুলো অচল কিন্তু নিঃসন্দেহে দামী। আমরা আন্দাজ করেছিলাম, সোনা, হীরা, জহরত সব মিলিয়ে দাম হবে দেড়লক্ষ ডলার। কিন্তু পরে বিক্রি করে আমরা অনেক বেশী পেয়ে ছিলাম।

লেগ্রাণ্ডকে আমি বারবার প্রশ্ন করেছি, বন্ধু এই গুপ্তধনের হদিশ তুমি কি করে পেলে?

সব জিনিসপত্র গুছিয়ে হিসেব করার পর লেগ্রাণ্ড যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কুবেরের ঐশ্বর্য এখন তার করায়ত্ত। তার মুখে চোখে এখন

আর কোনও উদ্‌ভ্রান্তির চিহ্ন নেই। মন মাথা ঠাণ্ডা। এবার সে লক্ষ্মীর ঝাঁপি সঙ্গে নিয়ে মূল ভূখণ্ডে নিজের আস্তানায় ফিরবে। সোনা-হীরে জহরত ধীরে ধীরে বিক্রি করে আবার অবস্থা ফিরিয়ে আনবে।

লেগ্রাণ্ড তার কথা শুরু করল ঃ

সেই রাতের কথা মনে কর বন্ধু। পোকাটার ছবি এঁকে কাগজটা তোমার হাতে দিলাম। তুমি বললে কাগজে পোকার ছবি নেই। মড়ার খুলির ছবি আঁকা আছে। ভাবলাম ঠাট্টা করছো। কাগজটা —আসলে ওটা পাতলা পার্চমেণ্ট কাগজ—চেয়ে নিলাম। সত্যি মড়ার খুলিই আঁকা। কাগজটা দুমড়ে আগুনে ফেলে দিতে যাচ্ছি। হঠাৎ খেয়াল হল, ভাল করে কাগজটার দিকে চেয়ে বুঝলাম, আমি যেখানে পোকার ছবি এঁকেছি, মড়ার খুলির ছবিটা ঠিক সেখানে দেই। তাছাড়া আমার ছবি আঁকার ধরন আলাদা। কাগজটা ভাল করে দেখার জন্যে দূরে ওই টেবিলে বসলাম। কাগজটা উল্‌টে দেখি, অপর পিঠে আমার আঁকা পোকার ছবিটা আছে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হবে, তোমাকে বা জুপিটারকে কিছু না জানিয়ে। মনে পড়ল, পোকার ছবি আঁকার আগে আমি ময়লা কাগজটার এপিঠ ওপিঠ দুদিকই দেখেছি, একটু পরিষ্কার জায়গায় ছবি আঁকার জন্য। কোথাও সামান্য কালির আঁচড় ছিল না, মড়ার খুলির ছবি এল কি করে? ভেবে দেখতে হবে। কাগজটা দেরাজের মধ্যে রেখে চাবি দিলাম।

তুমি চলে গেলে, বেশ একটু চটে। বাধা দিইনি। জুপি শুতে গেল। আগুনের ধারে বসে কাগজ মানে পার্চমেণ্টের টুকরোটা হাতে নিয়ে ভাবতে বসলাম। মড়ার খুলির ছবি আঁকল কে? যে কটা সূত্র জানা আছে, মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করলাম ঃ

১। সমুদ্রের ধারে জুপিটারকে নিয়ে বেড়াবার সময় সোনালী গুবরে পোকাটা হাত দিয়ে ধরতে যাই। পোকাটা তার দাঁড়া দিয়ে আঙ্গুল কামড়ে দিলে তাকে ফেলে দিই।

২। বালির মধ্যে একটা ভাঙ্গা নৌকোর কাঠ পোঁতা ছিল, তার পাশে বালির ভেতর থেকে উঁকি মারছিল কাগজের টুকরোটা। জুপি সেই কাদা বালি মাখা কাগজটা টেনে নিয়ে সেইটা দিয়ে পোকাটা চেপে ধরে। তারপর কাগজে মোড়া পোকাটা আমার হাতে দিলে আমি সেটা পকেটে রাখি।

৩। বাড়ি ফেরার পথে লেফটেন্যাণ্ট গ্রে'র সঙ্গে দেখা হতে তিনি পোকাটা দেখতে চান। ওটা

তখন মরে গেছে। পোকাটা লেফটেন্যান্টকে দেখতে দিই, কিন্তু কাগজ, অর্থাৎ পার্চমেন্টের টুকরোটা আমার হাতেই ছিল। লেফটেন্যান্ট গ্রে পোকাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান। পার্চমেন্টের টুকরোটা আমি পকেটে রাখি। ওটা আমার পকেটেই ছিল। পোকার ছবি আঁকার জন্যে কাগজ খুঁজতে পার্চমেন্টের টুকরোটা পাই। ওটার দুপিঠে কোথাও কালির আঁচড় ছিল না, পরিষ্কার জায়গা দেখে ছবি আঁকি। তাহ'লে মড়ার খুলির ছবিটা এল কোথা থেকে। আঁকলো কে? তোমার হাতে কাগজটা দেবার পব ভুতুড়ে কাণ্ডটা ঘটেছে। কি করে ঘটল?

৪। কাগজটা তোমার হাতে পড়ার পর যা যা ঘটেছিল পরম্পরা রেখে ভাবতে লাগলাম। তুমি কাগজটা ভাল করে দেখার আগেই উলফ এসে তোমায় 'আদর' করছিল। তুমি বাঁ হাত দিয়ে তাকে ঠেকাচ্ছিলে। কাগজটা ধরা ছিল তোমার ডান হাতে। ডান হাতটা দূরে সরিয়ে রেখেছিলে—ফায়ারপ্লেসটার খুব কাছেই ছিল হাতটা। আগুনের তাপ পড়ছিল কাগজটার ওপর, আমি তো একবার ভেবেছিলাম কাগজটায় আগুন না ধরে যায়। উলফ চলে যেতে তুমি ভালভাবে বসে কাগজটা দেখতে লাগলে, আর তখনই বললে কাগজটায় মড়ার খুলি আঁকা আছে।

৫। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, পার্চমেন্ট কাগজটার ওপর আগুনের আঁচ পড়েছিল বলেই তাপের প্রভাবে কাগজে ছবিটা ফুটে উঠেছে। জানইতো কয়েক প্রকার রাসায়নিক আছে যা দিয়ে কিছু লিখলে, শুকিয়ে যাবার পর লেখাটা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তাপ লাগলে লেখাটা আবার ফুটে ওঠে! এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাই ঘটেছে।

৬। আগেই বলেছি, কাগজটা পার্চমেন্টের টুকরো। পার্চমেন্ট কাগজ নষ্ট হয় না বলা চলে। লম্বাটে ধরনের চৌকোণা কাগজ, টুকরো তথ্য লেখা ইত্যাদির

জন্য ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের ধারে একটা ভাঙা নৌকোর পাশে বালিতে পোঁতা অবস্থায় পেয়েছি। লক্ষ্য করে দেখলাম, ছবিটা সব জায়গায় সমান ভাবে ফুটে ওঠেনি। পার্চমেন্টের ধারের দিকের রেখাগুলি বেশী স্পষ্ট। আঁচটা

কাগজের ওপর কমবেশি পড়েছে বলেই কি এরকম হয়েছে। তাহলে কি কাগজের বুকে অদৃশ্য কালি দিয়ে আরও কিছু লেখা আছে। গোটা কাগজটা ভাল করে আগুনে সেঁকলে হয়তো সমস্ত লেখাটা ফুটে উঠবে।

৭। বলতে পার মাথায় পোকা নড়লো। পার্চমেণ্ট কাগজের ওপর অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা আছে কোনও গোপন তথ্য—একমাত্র বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে যার পাঠোদ্ধার করা যাবে। মড়ার খুলি আঁকা চিঠির ওপর দিকে।.....মড়ার খুলি ছিল, জলদস্যুদের প্রতীক চিহ্ন! সমুদ্রের ধারে ভাঙা নৌকাটার কথা মনে পড়লো—দুর্ঘটনা বহুদিন আগে ঘটেছিল। নৌকোর কাঠ পচে গিয়েছিল। জলদস্যুরা ওইধরনের নৌকো—লংবোট ব্যবহার করতো। তাহলে কি ওই পার্চমেণ্টের বুকে অদৃশ্য কালির অন্তরালে জলদস্যুদের কোনও গোপন তথ্য—জরুরী খবর—লুকানো আছে। আর এভাবে জরুরী খবর লিখে রাখার অর্থ তো একটাই হতে পারে। এটা কি জলদস্যুদের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের হদিশ দেবে?

..... ফায়ারপ্লেস থেকে একটা মালসায় জ্বলন্ত আঙরা নিয়ে সেই আগুনের আঁচে কাগজটা সেঁকতে লাগলাম। মড়ার খুলির অস্পষ্ট রেখা আরও স্পষ্ট হল। কাগজের একেবারে তলার দিকে, যেখানে নাম সই করা হয় সেখানেই ফুটে উঠল আরও একটা ছবি। প্রথমে ভেবেছিলাম এবটা ছাগলের ছবি। ভালভাবে লক্ষ্য করে বুঝলাম, ওটা ছাগল নয়। ছাগল ছানা।

আমি বলি—ছাগল আর ছাগলছানায় তফাত কি?

লেগ্রাণ্ড হেসে বললে—আছে বন্ধু আছে। পার্থক্যটা বুঝতে আমারও একটু সময় লেগেছিল। ছাগলের ইংরেজী নাম হল গোট (GOAT) আর ছাগল ছানার ইংরেজী হল (KID) কিড।

—তাতে তফাতটা কি হ'ল।

লেগ্রাণ্ড বিজ্ঞের মতন হেসে বলে, শয়তানটার প্যাঁচ এইখানেই। কুখাত জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিড-এর কথা মনে পড়ে? ছাগলছানা অর্থাৎ কিড (KID) এর ছবি এঁকে সাঙ্কেতিক চিহ্নে ক্যাপ্টেন কিড স্মারকলিপিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করেছেন।

———

সোহিনীর ভালো বই

সোহিনীর পুজায় কিশোর সম্ভার

ঝিলমিল

হার্ড বোর্ডে বাঁধানো রেক্সিনের কভার

দাম ১৬ টাকা

ছোটদের রহস্য গল্পের অনবদ্য সংকলন

রহস্য বিচিত্রা

পেপার ব্যাক / ৬·০০

এ ছাড়া, ছোটদের জন্য বিদেশী ক্লাসিকের ভাষান্তর। পাতায় পাতায় রঙিন ছবি।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড * রবিনসন ক্রুসো * ড্রাকুলা * ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড * কাণ্ট্রি অব দ্য ব্লাইণ্ড * হ্যাকেলবেরী ফিন * অ্যারাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটটি ডেজ * সিন্দবাদ দ্য সেলার * ক্রাইম ডিটেকশন * গ্রেট এক্সপেক্টেশন * অলিভার টুইস্ট * কিং সলোমনস মাইনস

এক সঙ্গে উপরের বিশ্বের সেরা ১১টি কাহিনী সহ ৫টি শ্রেষ্ঠ গল্প নিয়ে

ছুটিতে ছোটাছুটি

৪০৲ টাকার বই ২৫৲ টাকায়

ব্রুস লীর মৃত্যু রহস্য ৩·৫০

চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ-এর

পূজা সংখ্যার

বিশদ বিবরণের জন্য আনন্দ বাজারের বিজ্ঞাপনে লক্ষ্য রাখুন

সোহিনী প্রকাশনী

২৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড/কলকাতা ৭০০ ০০১ ফোন—২২-২১৭০

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের
আগামী শারদীয়া সংখ্যা

তোমাদের জন্য সেরা রহস্য গল্প
উপন্যাস লিখবেন নামী ও দামী লেখকরা

বিশেষ আকর্ষণের ৪টি

সচিত্র কাহিনী, এছাড়া থাকবে প্রতিযোগিতা
গত বছরের থেকে অনেক সুন্দর ছবিতে ভরাট

সেরা আরও ২টি সচিত্র কমিক্স
গুপ্তধনের ক্যাপ্টেন কিডের রত্ন পেটি

এ ছাড়া আকর্ষণীয় বিভাগ ও অন্যান্য রচনা

টারজনকে নিয়ে (কমিকস) এবং রহস্য কমিক্স
মনেরেখোর বিজ্ঞানের প্রশ্ন মালার সঙ্গে ধাঁধা
ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের অ্যাডভেঞ্চার ভৌতিক, কাহিনী (ছবিতে) ঠিক সময়ে
পূজার আগেই তোমাদের হাতে তুলে দেব।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ : ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড : কলিকাতা-৭০০০০১ : ফোন ২২-২৭৭০

সেদিন সকালে প্রভাতী চায়ের টেবিলে বউদি আমাকে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা রুডলফ, জীবনে কী তুমি কোনদিনই কিছু করবে না ?

বউদিদির নাম রোজ।

আমি তাকে বল্লাম—কোন্ দুঃখেই বা করতে যাব ? আমি তো বেশ দিব্যি আছি। টাকার আমার অভাব নেই। সামাজিক সম্মানও আছে। আর তাছাড়া, লর্ড বার্ল্‌স্‌ডনের আমি ছোট ভাই আর লেডি বার্লস্‌ডনের মত সুন্দরী মহিলার আদরের দেওর। আমার আর কী চাই বল ?

—তোমার উনত্রিশ বছর বয়স হল—বউদি বল্‌ল—আর অ্যাদ্দিন তুমি কিছুটি করনি।—কেবল—

—কেবল ঘুরে বেড়ানো ছাড়া, এই তো। দেখ বাপু, আমাদের পরিবারের লোকেরা কাজকর্ম করে না।

দ্য প্রিজনার অফ জেণ্ডা

ডঃ সুপ্তি সেন

রোজ আমার কথায় একটু বিরক্তই হল বুঝতে পারলাম। কেন না, সে নিজে দেখতে যত সুন্দরই হোক ওদের পরিচয় আমাদের র‍্যাসেনডিলদের তুলনায় কিছুই না। তবে সৌন্দর্য ছাড়া অনেক টাকা পয়সাও সঙ্গে এনেছে ও, তাই আমার দাদা রবার্ট, লর্ড বার্ল্‌স্‌ডনও ওর বংশ পরিচয় নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি।

সে যাই হোক, রোজের কাছে আমার জীবন যত অর্থহীনই হোক, আমি কিন্তু এই ঘুরে বেড়ানো থেকেই যথেষ্ট আনন্দ আর জ্ঞান আহরণ করেছি। জার্মান স্কুল আর ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি আমি, ইংরেজীর মতই নিখুঁত জার্মান বলতে পারি। ফরাসীভাষাও জানি বেশ ভালই। ভাল তরোয়াল চালাই আমি, বন্দুকও চলে আমার হাতে ভাল। যে কোন ঘোড়াই আমার কাছে ঠিকমতই চলে।

আর সবচেয়ে বড় কথা আমার চুলের রং আগুনের মত টক্‌টকে হলেও মাথা আমার খুব ঠাণ্ডা।

—তোমাতে আর রবার্টে তফাৎ শুধু একটাই —বউদি বলে।—সেটা হল রবার্ট তার দায়িত্বগুলো বোঝে। তুমি কেবল বোঝ তোমার সুবিধেগুলো।

আমি বলি—আমার মত লোকের কাছে বউদি, সুবিধেই হল কর্তব্য।

—বাজে কথা, একদম বাজে কথা। এখন শোন।

সার জেকব বোরোডেল তোমাকে একটা মনের মত কাজ দিতে চান।

—অনেক ধন্যবাদ। আমি বলি। বউদি আমাকে বলে—মাস ছয়েক বাদে সার জেকব রাজদূতের পদ নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন। তোমাকে তাঁর সহকারী করে নিয়ে যেতে চান। রুডলফ, লক্ষ্মীটি, রাজী হয়ে যাও।

এখন, আমার বউদি অমন করে তার সুন্দর ভুরুদুটো কুঁচকে ছোট ছোট হাত মোচড়াতে মোচড়াতে অমন করে অনুরোধ করলে আমার পক্ষে না বলা মুস্কিল। তাছাড়া মনে হচ্ছে চাকরীটাতে মজাও কিছু পাওয়া যেতে পারে।

তাই বল্লাম দেখ বউদি যদি এই সামনের ছ'মাসে উলটোপালটা কিছু না ঘটে, আর সার জেকব তখনও আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী থাকেন, তাহলে আমি যাব।

—ওঃ রুডলফ।

আমার বউদি ভারী খুশী হয়ে উঠল।

তবে ছয়মাস অনেক দীর্ঘ সময়।

ছমাস সময় তো অমনি অমনি কাটানো যায় না।

তাই আমার মনে হল এর মধ্যে একবার রুরিটানিয়ায় ঘুরে এলে মন্দ হয় না। কেন না কাগজে দেখেছিলাম স্ট্রেলসো শহরে পঞ্চম রুডলফের অভিষেক হবে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই।

এই সুন্দর রাজ্যটাতে আমার কোনদিনই যাওয়া হয়ে ওঠেনি। রাজ্যটা ছোট হলেও ইওরোপের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এককালে অনেক কিছু ইওরোপকে দিয়েছে রুরিটানিয়া। এখন আবার তরুণ কোন শক্তিশালী রাজাকে সিংহাসনে পেলে এখনও হয়তো নতুন কিছু দিতে পারে।

ঠিক করলাম ওখানেই যাব।

কোথায় যাচ্ছি আত্মীয়স্বজনদের সেকথা বলে যাওয়া আমার অভ্যেস নেই। তার একটা বড় কারণ আমি চাই না তারা কেউ বাধা দেয়। তাই এবারে বল্লাম আল্পসের কাছাকাছি একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

রোজ শুনে যে খুব খুশী হল তা নয়, তবে যখন জানালাম দেখেশুনে ওই জায়গাটার সামাজিক আর রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে একটা বই লিখব তখন সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

—সেটা অবশ্য দারুণ হবে। তাই না, রবার্ট।

রবার্ট উত্তর দিল—হ্যাঁ রাজনীতিতে ঢোকবার সেটা একটা ভাল উপায়।

রবার্ট নিজেই বেশ কতগুলো বই লিখেছে।

রোজ বলল—তাহলে প্রতিজ্ঞা কর বই লিখবে।

—যদি যথেষ্ট বিষয়বস্তু পাই, নিশ্চয়ই লিখব।

—ঠিক আছে। বলে রবার্ট।

ওসব প্রতিজ্ঞা-টতিজ্ঞা আমি করি না। আসলে আমি মনেই করিনা আমার ভ্রমণ কাহিনী লেখা যেতে পারে।

এর থেকেই বোঝা যায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি।

কারণ এই তো আমি সেই না-করা প্রতিজ্ঞার জের টেনে একটা বই লিখতে বসেছি—যদিও রাজনীতিতে ঢুকবার জন্যে নয়। তা ছাড়া আল্পস্ কাহিনীও নয় এটা।

আর রোজকে যদি পড়তে দিই এ বই তার ভালও লাগবে না। অবশ্য তাকে আমি দিচ্ছিও না।

* * *

যখন আমার ট্রেন প্যারিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন একজন বন্ধু স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল।

গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কথা কইছি।

এমন সময় সে হঠাৎ একটি মহিলার সঙ্গে কথা কইতে গেল।

বেশ সুন্দরী, সুসজ্জিতা মহিলা। ফিরে এসে বন্ধু আমায় বললে—উনি হচ্ছেন আঁতোয়ানেত দ্য মবান, পয়সাওয়ালা বিধবা। লোকে বলে রাজা রুডল্‌ফের ভাই স্ট্রেলসোর ডিউক মহিলাকে মন দিয়েছেন।

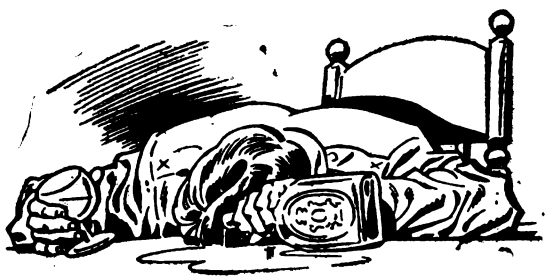

যাই হোক মহিলাটি আমার দিকে আর তাকালেন না। যদিও আমরা একট্রেনেই ছিলাম।

রুরিটানিয়ার বর্ডারে এসেই কাগজপত্তর বার করলাম আমি। যে অফিসারটি কাগজপত্র পরীক্ষা করছিল সে আমায় দেখে এমন চমকে উঠল যেন ভূত দেখেছে।

সে যা হোক, খবর পেলাম অভিষেকের দিন কোন কারণে হঠাৎ এগিয়ে এসেছে। আর মাত্র একটি দিনই বাকী। স্ট্রেলসো শহরে লোক গমগম করছে। হোটেল, থাকার ঘর সব ভাড়া হয়ে গেছে, আমি যে গিয়ে কোথায় উঠব!

সেই জন্যে ঠিক করলাম জেণ্ডা শহরেই নেমে পড়ব। রাজধানী থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে ওটা একটা ছোট্ট শহর, সীমান্ত থেকে পাঁচ ক্রোশ মাত্র।

সন্ধ্যেবেলায় ট্রেন পৌঁছে গেল সেখানে।

পুরো মঙ্গলবারটা এখানে পাহাড়ে টাহাড়ে ঘুরে কাটাব আমি। পুরনো দুর্গটাও দেখব। বুধবার সকালে ট্রেনে চেপে চলে যাব স্ট্রেলসো, রাত্রে আবার ফিরে আসব জেণ্ডায়।

এই মনে করে জেণ্ডায় ট্রেনটা থামতেই নেমে পড়লাম। শ্রীমতী মবান দেখলাম সোজা স্ট্রেলসোয় যাচ্ছেন। ওখানে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত আছে নিশ্চয়ই।

যে ছোট্ট হোটেলটায় উঠলাম—সেটাকে সরাইখানা বললেই ভাল হয়—সেটা চালায় এক মোটাসোটা বুড়ি আর তার দুই মেয়ে। দিব্যি ঠাণ্ডা, ভাল মানুষ লোক তারা।

মা দেখলাম ডিউককে বেশ পছন্দ করে,—ডিউকই আবার এখন জেণ্ডার দুর্গ আর জমিজমাগুলোর মালিক হয়েছেন কী না।

বুড়ির ভারী দুঃখ রুডল্‌ফের বদলে তার ভাই এই ডিউকই সিংহাসনে বসছেন না।

—ডিউক মাইকেলকে আমরা খুব ভালো করে চিনি। উনি সব সময়ে আমাদের মধ্যেই বাস করেন। রুরিটানিয়ার প্রতিটি লোক চেনে ওঁকে। কিন্তু রাজাকে চেনে না কেউই। বাইরে বাইরেই থেকেছেন। কজন যে ওঁকে চোখে দেখেছে কে জানে।

তার মেয়ে বল্‌ল—এখন আবার রাজা নাকি দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন। তাই বলা যেতে পারে কেউই তাঁকে চেনে না।

—দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন? মা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।—কে বলেছে?

—জোহান, যে ডিউকের বন পাহারা দেয়। সে সম্প্রতি রাজাকে দেখেছে।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজা তো এখন ডিউকের এখানকার বাগান বাড়িতে আছেন, তাই না? এখান থেকেই তো অভিষেকের জন্যে স্ট্রেলসো যাবেন।

কথাটা শুনে আমার বেশ মজা লাগল। কাল

একবার ডিউকের বাড়িটার দিকে যেতে হবে তো, দৈবাৎ যদি রাজার দেখা পেয়ে যাই।

বুড়ি আবার বল্‌লে—রাজা এখানে থেকে গেলেই পারেন, বুধবারে ডিউকের অভিষেক হতে পারে তাহলে।

কিন্তু আমি— মিষ্টি চেহারার ছোট মেয়েটি উত্তর দিল—আমি কালো মাইকেলকে পছন্দ করিনা। আমার চাই লাল চুল। রাজার চুল আমি শুনেছি টক্‌টকে লাল—ঠিক এই, ঠিক এই—

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেল্‌ল।

মা বলল—লালচুলকে অভিশাপ দিয়েছে অনেক পুরুষ।

—কিন্তু কোন মেয়ে মানুষ নয়। মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

দেখলাম ঝগড়াটা থামিয়ে দেওয়া উচিত, তাই জিগ্যেস করলাম—ডিউকের এই বাড়িতে রাজা এসেছেন কেন?

ডিউকই ওঁকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছে কী না। বুধবার অবধি উনি এখানেই থাকবেন। ডিউক নিজে এখন স্ট্রেলসোতে, অভিষেকের ব্যবস্থা করতে।

—তাহলে দু ভায়ের মধ্যে ভাব আছে বলুন। ছোট মেয়েটি পিছনে মাথা হেলাল—ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব। দুজন লোক যদি একই রাজত্ব আর একই রাজকন্যা চায় তাহলে তাদের যতটা ভাব থাকতে পারে ততটাই।

মা এবারে রেগে উঠল—একই রাজত্ব হতে পারে, কিন্তু একই রাজকন্যে! কী বলছিস তুই?

—কেন, এ তো সবাই জানে। কেলে মাইকেল রাজকুমারী ফ্লেভিয়াকে বিয়ে করার জন্যে পাগল। ফ্লেভিয়া রাণী হবে।

—হায়, আমি বলি—আপনাদের ডিউকের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার। কিন্তু ছোট ভাইয়ের তো আর উপায় নেই, বড় তার জন্যে যা বাকী রাখে তাই নিতে হবে।

মাদাম মবানের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

বাইরের দরজায় ধাক্কা দিল কে, আর একটি লোক ভেতরে এসে দাঁড়াল।

আমার গৃহকর্ত্রী বলে উঠলেন—এখানে একজন অতিথি উপস্থিত আছেন, জোহান।

তখন জোহান আমার দিকে তাকাল।

আমাকে দেখে যেন সে অজ্ঞানই হয়ে যাবে।

—কী হয়েছে জোহান? বড় মেয়েটি জিগ্যেস করল—এই ভদ্রলোক অভিষেক দেখতে এসেছেন।

ততক্ষণে লোকটি সামলে নিয়েছে, তবু আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েই রইল।

বলি—শুভসন্ধ্যা।

—শুভসন্ধ্যা, হুজুর।

হি হি করে হেসে উঠল ছোট মেয়েটা।

—এই দেখ জোহান সেই টক্‌টকে লাল রং। ও আপনার চুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। এই রংটা জেণ্ডাতে বড় দেখা যায় না।

—আমাকে মাপ করুন, সার—বললে জোহান। তার পরে ওদের শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরে গেলাম আমি। ছোট মেয়েটি আলো হাতে করে আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

—হয়তো আপনার ওটার রংটাই ও বেশী পছন্দ করে।

আমি পুরুষদের চুলের কথা বলছি।

—কিন্তু পুরুষদের রং-এ কী আসে যায়? আমি বলি।

—তা জানি নে। কিন্তু আপনার চুলের রংটা ভারী ভালো লাগছে—এটা ঠিক এলফবার্গদের মত লাল।

—পুরুষের চুলের রং-এর এক কানাকড়িও দাম নেই। আমি জোর দিয়ে বল্লাম।

—যাই দেখি গে রান্নাঘরটা বন্ধ হয়েছে কী না।—বলে মেয়েটি চলে গেল।

তখনও জানতাম না পুরুষের চুলের রং এর কী ভীষণ গুরুত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন বেড়াতে বেরোলাম। দেখলাম বনটার মধ্যে মাইল দশেক এগোলেই আরেকটা জনবিরল রেলস্টেশনে পৌঁছনো যায়।

সরাইয়ের মহিলাদের বিদায় জানিয়ে দুর্গাভিমুখী পাহাড়ে চড়তে গেলাম, সেখান থেকে ঢুকলাম জেণ্ডার বনে। এককালে এই দুর্গটা যুদ্ধের জন্যেই তৈরী হয়েছিল।

এখনও পুরনো অংশটা বেশ সুরক্ষিতই আছে।

দুর্গের চারপাশে পরিখা—বেশ গভীর প্রশস্ত,—আর, আরেকদিকে মৃতরাজার তৈরি করা এক হালফ্যাসানের প্রাসাদ। আপাততঃ এটাই স্ট্রেলসোর ডিউকের বাগানবাড়ি।

আরও কাছে এসে বুঝতে পারলাম পুরনো আর নতুন অংশদুটো একটা সেতু দিয়ে জোড়া আছে। সেতুটা প্রয়োজন মত তুলে বা নামিয়ে নেওয়া যায়।

এই সেতুটাই পুরনো দুর্গে যাবার একমাত্র পথ।

নতুন বাড়িটায় যাবার অবশ্য বেশ চওড়া রাস্তা আছে।

ভেবে দেখলাম ব্যবস্থাটা ডিউক মাইকেলের পক্ষে কীরকম সুবিধার।

যখন লোকজনের হাত থেকে পালাতে ইচ্ছে হবে তাঁর, স্রেফ ওই সেতুটা পেরিয়ে, তারপর ওটা তুলে নিলেই হল। তাঁকে বাইরে টেনে আনতে তখন দরকার হবে একপাল সৈন্য।

বনটি ভারী সুন্দর।

ঘণ্টাখানেক এর ঠাণ্ডা ছায়ায় হাঁটলাম, বসে রইলাম। গাছগুলো মাথার ওপর নুয়ে পড়েছে, পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর আঁকিবুকি।

একটা পড়ে থাকা গাছের গুড়ির ওপর বসে বসে পাইপ টানলাম অনেকক্ষণ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। মনেই ছিল না জায়গাটা ডিউকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

একটা মোটা গলার আওয়াজে চট্‌কাটা ভেঙে গেল।

—আরে তাজ্জব কী বাত।' দাড়ি কামিয়ে দিলেই এই লোকটাকে ঠিক রাজার মত দেখাবে।

চোখ মেলে দেখি দুটো লোক পরম বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছে।

দুজনেরই পরনে শিকারের পোশাক কাঁধে বন্দুক।

একজন বেঁটে, শক্তপোক্ত, তার মাথাটা চৌকোনা, মুখে সাদা গোঁফ আর হাল্কা নীল চোখ।

অন্য জন যুবক, রোগাটে, মাথায় মাঝারি, কালো চুল, সুদর্শন।

প্রথমজন নিঃসন্দেহে সৈনিক, দ্বিতীয় জন অভিজাত বংশীয় ভদ্রলোক, কিন্তু বোধহয় তার সঙ্গেও সেনা-বাহিনীর কোথায় একটা যোগ আছে।

পরে জেনে ছিলাম আন্দাজ আমার নির্ভুল।

বয়স্ক লোকটি প্রথমে আমার দিকে এগিয়ে এল, পিছনে পিছনে শিষ্টতা সম্মত কায়দায় টুপি খুলল যুবকটি।

উঠে দাঁড়ালাম।

—আরে মাথায়ও যে রাজার মতই লম্বা—আমার ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতা লক্ষ্য করে প্রথম লোকটি বললে।

—আপনার নাম জানতে পারি?

হেসে বলি—আপনারাই যদি আপনাদের পরিচয় আগে দেন ভালো হয় নাকি?

যুবক হেসে উত্তর দিল—ইনি কর্নেল স্যাপ্ট, আর আমি হচ্ছি ফ্রিট্‌জ্‌ ফন টারলেনহাইম। আমরা দুজনেই রুরিটানিয়ার রাজসেনা দলে আছি।

টুপি খুলে নমস্কার করলাম।

—আমি রুডল্‌ফ র‍্যাসেনডিল, ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছি। একবার বছর দুয়েকের জন্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সেনা দলে ছিলাম।

—তাহলে আমরা এক গোষ্ঠীর লোক বলুন—ফ্রিট্‌জ তার হাত বাড়িয়ে দিল।

গম্ভীর গলায় স্যাপ্ট বললেন—দেখুন মিস্টার র‍্যাসেনডিল, আপনি হয়তো জানেন না আপনাকে হুবহু আমাদের রাজার মত দেখতে।

শুনেই কেমন অস্বস্তি হতে লাগল।

মনে পড়ে গেল আমায় দেখে স্টেশনের অফিসার আর জোহান দুজনেই কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

একথাটা জানলে রুরিটানিয়ায় আসতাম না।

যাই হোক, এখন আর কী করব!

ঠিক সেই সময় পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল—ফ্রিট্‌জ! কোথায় তুমি?

টার্লেনহাইম আমার দিকে তাকিয়ে বললে—রাজা ডাকছেন।

গাছের আড়াল থেকে এক যুবক লাফিয়ে আমাদের সামনে এল। হো হো করে হেসে উঠলেন স্যাপ্ট। লোকটিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। আর সে আমায় দেখে বিস্ময়ে পিছু হটে গেল। শুধু আমার গোঁফ দাড়ি, আর তাঁর রাজকীয় চাল-চলন ছাড়া রুরিটানিয়ার রাজা আর রুডল্‌ফ র‍্যাসেনডিলে কোন তফাৎ নেই।

প্রথমে রাজাই কথা বললেন।

—ফ্রিট্‌জ, কে এই ভদ্রলোক?

স্যাপ্ট গম্ভীরভাবে বল্লেন—দেখা যাচ্ছে মহারাজ আপনার একজন অবিকল প্রতিরূপ আছে।

রাজা ভাল করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তারপর হেসে উঠলেন উচ্ছ্বসিত ভাবে।

—দেখা হয়ে খুব ভাল হয়েছে ভাই। আমার

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা ক্ষমা করবেন। এখন বলুন কে আপনি, কোথায় যাবেন ?

তাঁকে বল্লাম।

আমার স্ট্রেলসো যাবার কথা শুনে মাথা নাড়লেন রাজা।

হেসে বললেন—ফ্রিট্‌জ, আমাদের এই একজোড়াকে

দেখে মাইকেলের মুখের যে অবস্থা হবে তা দেখবার জন্যে হাজার পাউণ্ড দিতে পারি আমি।

উত্তরে ফ্রিট্‌জ বল্লেন—সত্যি কথা বলতে কী, মহারাজ, আমার মনে হয় না মিস্টার র‍্যাসেনডিলের এখন স্ট্রেলসো যাওয়া উচিৎ।

সিগারেট ধরিয়ে রাজা স্যাপ্টের দিকে তাকালেন। স্যাপ্টেরও ওই মত—উনি এখন যাবেন না।

—তার মানে, রাজা বলেন—মিস্টার র‍্যাসেনডিলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব যদি উনি এখন স্ট্রোলসোতে না যান—

—ওহো, আদেশের ভঙ্গীতে বলুন—বলে স্যাপ্ট। আমি সত্যি বিরক্ত হলাম এবার।

—ঠিক আছে মহারাজ। আজ রাত্তিরেই রুরিটানিয়া ছেড়ে চলে যাব আমি।

—না আপনি যাবেন না। রাজা বলে ওঠেন। কেমন এবার ঠিক আদেশের ভঙ্গীতে বলেছি কী না। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন। তারপর যা হয় হবে। প্রত্যেকদিনই কেউ একজন অবিকল এক চেহারার ভাইয়ের দেখা পায় না।

স্যাপ্ট আর ফ্রিট্‌জও এ পরিকল্পনায় রাজী হলেন সুতরাং আমরা সবাই মিলে বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। রাজা ভারী চমৎকার কথা বলেন।

আধঘণ্টা টাক হাঁটার পর একটা মোটা ধরনের ছোটখাট বাড়ির সামনে এসে পৌছলাম। বাড়িটা একতলা, কাঠের তৈরী।

আমাদের দেখেই একজন পরিচারক এগিয়ে এল, তার সঙ্গে একটি মোটাসোটা মেয়েমানুষ, যে পরে জেনেছিলাম, বনরক্ষী জোহানের মা।

—ডিনার তৈরী হয়েছে জোসেফ ?

রাজা জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ মহারাজ।

একটু পরে টেবিলে এসে গেল প্রচুর খাবার।

মদ্য-পানীয়ের আদেশ দিলেন রাজা।

ফ্রিট্‌জ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—কালকের কথাটা মনে রাখবেন। খুব সকাল সকাল উঠতে হবে আমাদের।

স্যাপ্টও হেসে বললেন—হ্যাঁ কালকের দিনটা মনে রাখবেন।

রাজা আমার স্বাস্থ্যপান করলেন, আমায় বললেন তাঁর নবলব্ধ ভাই।

উত্তরে বল্লাম—এলফবার্গদের স্বাস্থ্য কামনা করি।

খাদ্যবস্তুগুলো তেমন রাজকীয় না হলেও পানীয় কিন্তু সত্যিই অতুলনীয়।

পানও করলাম যথেষ্ট পরিমাণে।

ফ্রিট্‌জ্‌ মাঝে মাঝে ব্যর্থ চেষ্টা করলেন রাজাকে থামাতে।

একটু পরে হলে ছেড়ে দিয়ে নিজেই পান করতে লাগলেন প্রচুর ভাবে।

অল্পসময়ের মধ্যেই অনেক মদ গেলা হয়ে গেল আমাদের। বকবক শুরু করলাম আমরা।

রাজা বলতে লাগলেন ভবিষ্যতে তিনি কী করবেন। স্যাপ্ট বললেন অতীতে তিনি যা যা করেছেন সেই সমস্ত, ফ্রিট্‌জ্‌ বললেন কোন সুন্দরী মেয়ের কথা, আর আমি ব্যাখ্যা করলাম রুরিটানিয়ার ঐশ্বর্য। সবাই একসঙ্গে কথা কইতে লাগলাম।

কালকের কথা কারোরই মনে রইল না।

অবশেষে চেয়ারে হেলান দিয়ে রাজা জানালেন—আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

অম্‌নি জোসেফ এসে একটা পুরনো বোতল সামনে রাখল।

—ডিউক আমায় বলেছেন সব সেরা এই পানীয়টি রাজাকে সবশেষে উপহার দিতে।

শুনেই রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন—বা, বেশ বলেছে মাইকেল ভাই। কই খোল বোতলটা, জোসেফ। এটাই আমার শেষ বোতল।

মদটা চাখতে চাখতে রাজা আমাদের বল্লেন ভাই, বন্ধুরা, রুডলফ, আমার প্রিয় ভাই, তোমাদের সবই দিয়ে দিতে পারি অর্ধেকটা রুরিটানিয়া পর্যন্ত। কিন্তু এই অপূর্ব বোতলের একটা ফোঁটাও দেব না।

বলেই ঢক্‌ঢক্‌ করে গলায় ঢেলে দিলেন বোতলটা।

তারপরই খালি বোতলটা ছুড়ে ফেললেন দেয়ালে। কাঁচভাঙার শব্দটা কানে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * *

আচম্‌কা ঘুম ভেঙে উঠে বসি। আমার সারা গা ভিজে।

দেখি স্যাপ্টের হাতে একবালতি জল।

পাশেই ফ্রিট্‌জ্‌, মুখখানা একদম সাদা, টেবিলে বসে রয়েছেন।

রাগে গরগর করে বল্লাম—আপনাদের ইয়ার্কির মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে।

—এখন ঝগড়া করার সময় নয়। স্যাপ্ট উত্তর দিলেন।—আপনাকে জাগাবার আর কোন উপায় ছিল না, তাই। পাঁচটা যে বেজে গেছে।

—তাতে আমার কী?

তখনও আমার রাগ পড়ে নি।

ফ্রিট্‌জ্‌ আমার হাতে ধরে বললেন—র‍্যাসেনডিল, ওই দেখুন।

দেখলাম।

রাজা মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর মুখ চুলের মতই লাল, নিঃশ্বাস ভারী।

স্যাপ্ট অবজ্ঞার সঙ্গে পা দিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারলেন, কোন সাড়া এল না।

দেখলাম আমার মতই রাজারও মুখ আর মাথা ভিজে।

ঝুকে পড়ে রাজার পাল্‌স্‌ দেখলাম।

ভীষণ আস্তে নাড়ীর গতি।

—ওই শেষ বোতলটায় ওষুধ মেশানো ছিল। বল্লাম —ডাক্তার ডাকতে হবে।

—এখানে কোন ডাক্তার নেই। আর হাজারটা ডাক্তারেও আজ ওঁকে স্ট্রেলসোয় নিয়ে যেতে পারবে

না।

—কিন্তু অভিষেকের কী হবে ?

—খবর পাঠাতে হবে। রাজা অসুস্থ।

ফ্রিটজের উত্তর শুনে স্যাপ্ট বিদ্রূপ ভরে হাসেন —আজ এর অভিষেক না হলে কোনদিনই হবে না।

—কেন ? জানতে চাইলাম।

—রাজাকে দেখবে বলে সমস্ত লোক জড় হয়েছে। দেশের অর্ধেক সৈন্য নিয়ে কালো মাইকেলও হাজির। এখন কী করে জানাব রাজা মদ খেয়ে অজ্ঞান ?

—বলুন রাজা অসুস্থ।

—অসুস্থ ? আবার ঘৃণার হাসি হাসলেন স্যাপ্ট। লোকেরা রাজার অসুখের ব্যাপার ভালো করেই জানে। এর আগেও অসুস্থ হয়েছেন রাজা।

—কী ভাববে লোকেরা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না—ফ্রিট্‌জ বলেন।

স্যাপ্ট আমায় জিগ্যেস করলেন—আপনি বলছেন রাজাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে।

—হ্যাঁ।

—তাহলে কে ওষুধ দিলে ? কালোমাইকেল ? কারণ ? অভিষেক হতে না দেওয়া। আপনি জানেন, স্যাপ্ট ফ্রিট্‌জকে বলেন—স্ট্রেলসোর অর্ধেক লোক মাইকেল রাজা হলেই খুশী হবে। পঞ্চম রুডোল্‌ফ আজ যদি রাজা না হতে পারেন, তবে মাইকেলই হবে রুরিটানিয়ার রাজা।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব।

তারপর স্যাপ্ট আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—যত বয়স বাড়ে, মানুষ ভাগ্যে বিশ্বাস করে। ভাগ্যই আপনাকে পাঠিয়েছে। ভাগ্যই আপনাকে স্ট্রেলসোয় নিয়ে যাবে।

—মানে ?

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

ফ্রিট্‌জের মুখেও আলো।

—অসম্ভব—আমি বলি—আমায় চিনে ফেলবে।

—একটা ঝুকি নিতে হবে। তেমনি আবার একটা সুফলও পাওয়া যাবে। দাড়ি কামালে আপনাকে আর চেনা যাবে না। ভয় পাচ্ছেন না তো ?

—তার মানে ? আবার রেগে উঠি।

—আমায় মাপ করুন। কিন্তু কী জানেন, যদি ধরা পড়ে যান আপনার জীবন যাবে—আমার আর ফ্রিট্‌জেরও। কিন্তু আপনি না হাজির হলে আজ রাতে মাইকেল রাজা হবে আর আসল রাজা থাকবেন জেলে, নয়তো কবরে।

—রাজা কখনই এটা ক্ষমা করবেন না।

—আমরা কী মেয়ে মানুষ ? এই লোকটার ক্ষমা করা নিয়ে কে মাথা ঘামায়।

চুপচাপ কেটে গেল কয়েকটা সেকেণ্ড।

পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর···

তারপর বোধ হয় মুখের ভাব বদলে গেল আমার....

হাতে ঝাঁকি দিয়ে বুড়ো স্যাপ্ট চেঁচিয়ে উঠলেন,

—তাহলে আপনি যাবেন ?

—হ্যাঁ, যাব।

মাটিতে লম্বমান রাজার দেহটার দিকে তাকিয়ে বলি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দুটো ঘণ্টা কেটে গেল যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।

ভাবনা চিন্তা গুলো আমার হয়ে স্যাপ্টই করছিলে অবশ্য। মাঝে মাঝে ফ্রিট্‌জও।

স্যাপ্ট জোসেফকে ডেকে আমার দাড়িগোঁফ কামিয়ে

দিতে বললেন। রাজাকে নীচে মদের গুদামে নিয়ে যাওয়া হল।

জোহানের মা বুড়ি আড়ি পেতে কথা শুনছিল। স্যাপ্ট তাই মুখে একটা রুমাল হাত পা বেঁধে তাকে ফেলে রাখলেন ঐ মাটির তলার গুদামেরই একটা ঘরে।

কিন্তু রক্ষীরা ?

ফ্রিটজ বললেন রক্ষীরা যে জানতে পারবে।

—মাইকেল রাজার সঙ্গে যাবার জন্যে একজন লোক পাঠাচ্ছেন। রক্ষীদের না নিয়েই আমরা চলে যাব, জেণ্ডার বদলে হফবো স্টেশনে ট্রেনে চাপব, আর রক্ষীরা এসে পৌঁছবার আগেই পাখী উড়ে যাবে।—

স্যাপ্টের উত্তর।

রাজার সাদা ইউনিফর্ম পরে নিলাম আমি, স্যাপ্ট আর ফ্রিট্‌জও তৈরী হয়ে নিলেন।

জোসেফের ওপর হুকুম রইল আমরা না ফেরা পর্যন্ত নীচের গুদাম পাহারা দেবার।

ঘোড়ায় চেপে বনের মধ্য দিয়ে ছুটে গেলাম আমরা। চলতে চলতে স্যাপ্ট আমাকে রাজার অতীত জীবন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ইত্যাদির খবর দিতে লাগলেন। রুরিটানিয়ার রাজসভার নিয়ম কানুনও জানালেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন সবসময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

ফ্রিট্‌জ যেন স্বপ্নে চলেছেন, তাঁর মুখে কথা নেই।

স্টেশনে হাজির হলাম আমরা। ফ্রিট্‌জ হতভম্ব স্টেশনমাস্টারকে বোঝালেন রাজা তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছেন।

ধীরে ধীরে ট্রেনটা এসে থামল।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসবার পরেই স্যাপ্ট আবার আমাকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন।

রাজার হাত ঘড়িতে এখন আটটা।

বললাম—ওরা যদি আমাদের আনতে গিয়ে থাকে। ভাবি, দুর্গের মধ্যে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে।

—এখান আর ভেবে লাভ নেই—স্যাপ্ট বললেন, এখন খালি ভাবুন আপনি রাজা।

সাড় নটা নাগাদ জানলা দিয়ে মহানগরীর বাড়িঘর গুলো দেখা গেল।

আপনার রাজধানী, মহারাজ—হাত নেড়ে হো হো করে হাসলেন স্যাপ্ট। তারপর ঝুঁকে আমার নাড়ী দেখলেন।—একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছে।

—আমি পাথর নই।

—ঠিক আছে, আপনাকে দিয়েই চলবে। আর ফ্রিটজ সবাইকে বলব তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে। তুমি একটা পাতার মত কাঁপছ কী না।

—আমরা এক ঘণ্টা আগে পৌঁছে গেছি। স্যাপ্ট আবার বললেন।

—আপনার পৌছনোর খবর পাঠাচ্ছি আমি।—আর ইতিমধ্যে।

—ইতিমধ্যে আমি বলে উঠি—রাজার প্রাতরাশ চাই।

—ঠিক এলফবার্গের মত কথা—স্যাপ্ট হাসেন।

ট্রেন থামতেই ফ্রিট্‌জ আর স্যাপ্ট লাফিয়ে নামলেন। হেলমেট খুলে ফেলে আমার জন্যে দরজা খুলে ধরলেন তাঁরা।

গলায় একটা পিণ্ড অনুভব করলাম।

তারপর জোর করে হেলমেট মাথায় পরে গাড়ি থেকে নেমে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল গোলমাল!

লোকেরা ছুটোছুটি করতে লাগল। আমাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেল। চারপাশে ছুটোছুটি করতে লাগল মানুষ।

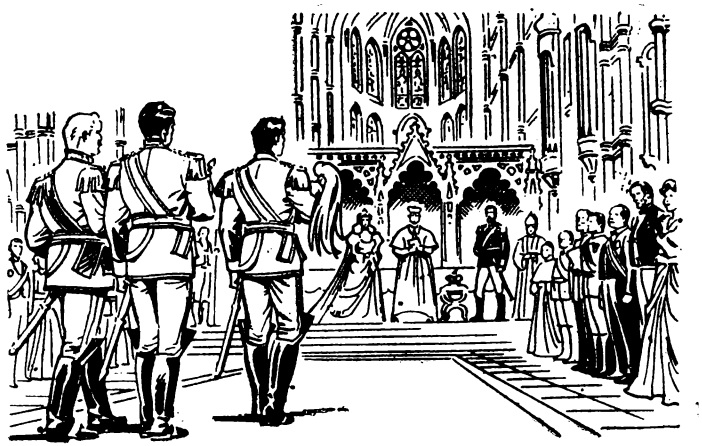

কফি শেষ হতে না হতেই শহরের সব ঘণ্টা গুলো বেজে উঠল—ব্যাণ্ড বাজতে লাগল তার সঙ্গে।

লোকেরা চিৎকার করে উঠল—গড় সেভ দ্য কিং।

স্যাপ্ট ফিস ফিস করে বল্লেন ঈশ্বর তুই রাজাকেই রক্ষা করুন। তাঁর মুখে হাসি।

আমায় বল্লেন—সাহস রাখুন, বন্ধু।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতেই কিছু অফিসার এবং সম্ভ্রান্ত লোক আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। সামনেই একজন লম্বা বৃদ্ধ লোক।

স্যাপ্ট ফিসফিস করে বললেন—সেনাপতি স্ট্র্যাকেন্স অর্থাৎ রুরিটানিয়ার প্রধান সেনানায়ক।

তাঁর পেছনেই আবার লম্বা ঝুল পোশাকে একজন বেঁটে খাটো লোক।

উনি চ্যান্সেলর—আবার স্যাপ্টের ফিসফিসানি।

ইনিই তাহলে আমার প্রধান মন্ত্রী।

সেনাপতি আমায় তুএকটি কথায় সম্ভাষণ করলেন। ডিউকের অনুপস্থিতির জন্যে মার্জনাও চাইলেন তিনি।

ডিউক নাকী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্টেশনে আসতে পারেন নি।

গীর্জায় আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আরও কয়েকজন লোক এগিয়ে এসে সম্ভাষণ করলেন। কারুর মনেই কোন সন্দেহ আছে মনে হল না। আস্তে আস্তে মনে কিছুটা বল পেলাম। অবশ্য ফ্রিটজ এখনও নার্ভাস। করমর্দনের জন্য সেনাপতির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর হাত কাঁপছে।

তারপর শুরু হল আমাদের শোভাযাত্রা।

ঘোড়ায় উঠলাম আমি। আমার ডান দিকে রইলেন সেনাপতি, বাঁদিকে স্যাপ্ট।

অনেকগুলি গাড়ি এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী সঙ্গে চললেন আমাদের।

স্ট্রেলসো এক বিচিত্র শহর। এর কিছু অংশ একেবারে পুরনো, কিছু অংশ আধুনিক।

নতুন ঝকঝকে রাস্তাঘাট আর সুন্দর বাড়ি একদিকে, অন্য দিকে আবার পুরনো শহরের ঘিঞ্জি ভাঙাচোরা রাস্তা।

বাইরের দিকটায় বড়লোকদের বাড়ি, ভেতর দিকে বেশীরভাগই দোকানপাট। হয় তো সামনের দিকটা হালফ্যাসানের ইমারতে ভর্তি আবার সেই রাস্তারই পেছন দিকে দরিদ্র এবং অপরাধী শ্রেণীর বাস।

এসব খবরও জানতে পারলাম স্যাপ্টের কাছ থেকে। আরও একটা গুরুতর ভাগাভাগির কথা জানা গেল।

নতুন শহরের লোকেরা রাজার দলে হলেও পুরনো শহরে জনপ্রিয় মাইকেল।

বড় রাস্তা দিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা রাজপ্রাসাদে এল। এখানে আশেপাশে সব আমারই অনুগত লোক, বাড়ির ছাদে ছাদে পতাকা।

চার পাশে হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা।

নিজেকে ঠিক রাজার মতই মনে হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ ওপর দিকে একটা জানলায় চোখ পড়ল আচমকা। জানলায় একটি চেনা মুখ—আঁতোয়নেত দ্য মবান।

আঁতোয়ানেত ঝুঁকে পড়ে নিরীক্ষণ করছেন আমায়। আপনিই আমার হাতে চলে গেল কোমরে বাঁধা রিভলবারে। মেয়েটি যদি চেঁচিয়ে ওঠে—একে? এতো রাজা নয়।

যাই হোক, আমরা এগিয়ে গেলাম।

সেনাপতি কী একটা বললেন—আর অশ্বারোহী দেহরক্ষীরা আমায় ঘিরে নিয়ে চললেন। এবার আমরা মাইকেলের প্রিয় গরিব এলাকা দিয়ে চলেছি। পরিষ্কার বুঝলাম, জায়গাটা আমার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক।

তবু বলি—এরকম করলেন কেন, মার্শাল? মার্শাল তাঁর গোফ কামড়ালেন। বিড়বিড় করে বললেন—নিরাপত্তার জন্যে, মহারাজ।

থামিয়ে দিলাম ঘোড়া।

হুকুম দিলাম—সামনের লোকেরা এগিয়ে যাক—পঞ্চাশগজ। আপনি সেনাপতি, আর কর্নেল স্যাপ্ট ও অন্যান্য বন্ধুরা—অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আমি পঞ্চাশ গজ যাচ্ছি। লোকেরা দেখুক তাদের রাজা তাদের বিশ্বাস করেন।

স্যাপ্ট আমার হাতে একটা হাত রাখলেন, ঠেলে সরিয়ে দিলাম সে হাত।

সেনাপতি এখনও দ্বিধা করছেন।

বলে উঠি—আমার কথা বুঝতে পারছেন না?

তখন মার্শাল আবার গোঁফ কামড়ালেন এবং আমার ইচ্ছামত সৈন্যদের অর্ডার দিলেন। স্যাপ্ট গোপনে হাসছেন। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন।

আমি যদি খোলা রাস্তায় খুন হই, স্যাপ্টের অবস্থা সঙ্গীন হবে নিশ্চয়ই।

এইভাবে একা একা যেতে বেশ ভাল লাগছে। লোকেদের মন্তব্য মাঝে মাঝে কানে আসে।

প্রথমে কিছু বিড়বিড়—তারপরে হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। আমি জানি সাদা ইউনিফর্মে আমাকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে।

কেউ কেউ দু'একটা ভাল মন্তব্য করল।

কিন্তু অধিকাংশ লোকই রইল নীরব। আর আমার প্রিয় ভাইয়ের ছবি দেখা যাচ্ছিল বেশীর ভাগ জানলার ফাঁক দিয়েই।

এমনি করে একসময় গীর্জায় এসে পৌঁছলাম। এতক্ষণে আমার বোধ হল কী করতে যাচ্ছি আমি। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ঘোড়া থেকে নামলাম—সবই ভয়ানক অবাস্তব। প্রায় অন্ধ চোখে প্রাচীন গীর্জার ভিতরে হেঁটে চললাম—চারপাশের অভিজাত মণ্ডলীর কাউকে যেন দেখতেই পেলাম না। কেবল দুটো মুখ নজরে এল। একটি সুন্দরী মেয়ের—তার চুল ঠিক এলফবার্গ পরিবারের মতই টকটকে লাল—মেয়েদের পক্ষে রংটা অপূর্ব—আর একটি ঘনকৃষ্ণ চুলের একটি পুরুষের মুখ। লোকটি আমাকে দেখে চমকে উঠল। যেন ভূত দেখছে।

তারপরে অভিষেক অনুষ্ঠানের আর কিছুই মনে নেই—কেবল কার্ডিনালের হাত থেকে মুকুটটি নিয়ে মাথায় পরেছিলাম মনে পড়ে। একজন নকীব হাঁকলে রাজকুমারী ফ্লেভিয়া।

রাজকুমারী নীচু হয়ে অভিবাদন করলেন ও আমার হাতে চুমু খেলেন।

কী করা উচিৎ ভাববার আগেই সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রধান পুরোহিত, কালো চুল মাইকেল, তারপর চাপা হাসি হাসতে হাসতে স্যাপ্ট। আমার প্রিয় ভাই দেখলাম ঝরাপাতার মত কাঁপছেন।

কিন্তু তাঁর মুখে কী ফ্লেভিয়ার মুখে, কী উপস্থিত কারও মুখে কোন সন্দেহের চিহ্ন নেই।

আমরা আবার শোভা যাত্রা করে প্রাসাদে ফিরে চললাম।

এখন আমি একটা গাড়িতে চলেছি—পাশে ফ্লেভিয়া।

কে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—তাহলে বিয়েটা হচ্ছে কবে?

অম্‌নি আরেকজন তার গালে চড় বসিয়ে দিল।

বল্‌লে—ডিউক মাইকেল দীর্ঘজীবী হন।

ফ্লেভিয়ার মুখে রঙের খেলা লক্ষ্য করি।

এইবার আমি একটু বিপদে পড়লাম।

কেন না, স্যাপ্টকে জিগ্যেস করে নেওয়া হয় নি ফ্লেভিয়ার প্রতি আমার কীরকম মনোভাব এবং ফ্লেভিয়া ও আমার (অর্থাৎ রাজার) মধ্যে কী কী ঘটেছে। তাই চুপ করেই রইলাম।

একটু পরে ফ্লেভিয়া আমার দিকে চাইল।

—জানো রুডলফ, তোমায় আজকে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছে।

আশ্চর্য নয় ব্যাপারটা। তবু আমার অস্বস্তি হল।

ফ্লেভিয়া আবার বল্‌ল—তোমায় অনেক গম্ভীর দেখাচ্ছে। একটু রোগাও। শেষ পর্যন্ত তাহলে জীবনটাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করলে?

কিছু ত বলতে হবে।

তাই ফিস ফিস করে বলি—তা হলেই কী তুমি খুশি হও?

—আমার মনের কথা তো তুমি জান।—বলে ফ্লেভিয়া অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বলে উঠি—তোমার যা ভাল লাগে তাই তো করতে চেষ্টা করি।

ফ্লেভিয়ার মুখে হাসি। গালেও একটু রঙের আভা। রাজার পার্টটা ভালই চালাচ্ছি মনে হচ্ছে।

তাই আরও বলতে থাকি।

—সত্যি কথা বলতে কী, রাজকুমারী, আজকের ব্যাপারগুলোর মত এত অভিভূত আমাকে আর কিছুতেই করে নি।

ফ্লেভিয়া আবার হাসল।

তারপরেই তার মুখ হয়ে গেল গম্ভীর।—মাইকেলকে লক্ষ্য করেছিল?

—হ্যাঁ, ওর বিশেষ ভাল লাগছিল না, তাই না?

—খুব সাবধানে থেকো। ওর ওপরে নজর রেখো, কেমন?

—এটা জানি যে আমি যা পেয়েছি ও তাই চায়।

আর, রাজার হয়ে আরেকটু যোগ করে দিই—

—আর আমি একদিন যা পাব আশা করছি তাও।

সত্যিকারে রাজা হলে ফ্লেভিয়ার উত্তর আমাকে উৎসাহিত করত।

সে বলে—আজকে এই একদিনে কী যথেষ্ট দায়িত্ব পাও নি তুমি?

দুমদাম্ গুলির আওয়াজ চলে।

রাজপ্রাসাদের দরজায় এসে গিয়েছি আমরা।

বন্দুক ছোঁড়া হচ্ছে অভ্যর্থনায়। রাজকন্যাকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাই, চওড়া সিঁড়ে বেয়ে ভিতরে যাই। বিশাল খাবার ঘরটায় ভৃত্যদের সারি।

টেবিলে রাজকুমারী আমার ডানদিকে বসলেন ভাই মাইকেল বাঁ দিকে।

বাকী সম্ভ্রান্ত লোকেরাও আসন নিয়েছেন। স্যাপ্ট দাঁড়িয়ে আছেন আমার চেয়ারের পিছনে। টেবিলের অন্য প্রান্তে মদের গ্লাস নিঃশেষে পান করছেন ফ্রিট্‌জ্‌…

এতক্ষণে ভাববার সময় পেলাম হতভাগ্য রুরিটানিয়ার রাজার কথা। কে জানে তিনি এখন কী করছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজার সাজপোশাকের ঘরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা তিনজনে, ফ্রিট্‌জ্‌, স্যাপ্ট আর আমি।

একটা গদি মোড়া চেয়ারে এলিয়ে পড়ি।

স্যাপ্ট পাইপ ধরান। আমার সুন্দর অভিনয়ের প্রশংসা তিনি করলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে খুব খুশী সেটা বুঝতে পারছিলাম।

ফ্রিট্‌জকে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে।

—আপনার পক্ষে কী স্মরণীয় দিন!—ফ্রিট্‌জ্‌ বলেন—আমি নিজেই বারো ঘণ্টার জন্যে রাজা হতে রাজী আছি। আপনি আর রাজকুমারী যখন গল্প করছিলেন কালো মাইকেল আরও কালো হয়ে গিয়েছিল।

—রাজকুমারী ভারী সুন্দর!

—মেয়েদের কথায় মন দেবেন না—স্যাপ্ট গজরে ওঠেন। এখন আপনি ফেরার জন্যে প্রস্তুত?

—হ্যাঁ। আমি উত্তর দিই।

এখন পাঁচটা আর বারোটার সময় আবার আমি রুডলফ র‍্যাসেনডিল হয়ে যাব। হাসতে হাসতে এই কথা বললাম।

স্যাপ্ট উত্তর দিলেন—আপনি যে স্বর্গীয় রুডলফ র‍্যাসেনডিল হয়ে যাচ্ছেন না এই আমার ভাগ্য। আমার ঘাড়ে সব সময় মাথাটা কাঁপছে। মাইকেলের কাছে জেণ্ডা থেকে খবর এসেছে। পাশের ঘরে গিয়ে খবরটা পড়েছে সে। বাইরে যখন এল রাগে ফুলছে তখন।

—চলুন ফেরা যাক।

মাইকেলের খবর শুনে ফেরবার ইচ্ছেটা আরও উদগ্র হয়ে উঠল আমার।

স্যাপ্ট ফ্রিট্‌জকে নির্দেশ দিতে লাগলেন—এখন রাজা শুতে যাবেন। তিনি ক্লান্ত। ফলে সকাল নটার আগে কেউ তাঁর দেখা পাবে না। কেউই না। এমন কী মাইকেলও না। আমরা যখন থাকব না, এই ঘরটার দরজা যদি কেউ খোলে তুমি আর জীবিত থাকবে না।

—অত করে বলতে হবে না।

ফ্রিট্‌জ একটু বিরক্ত হলেন।

স্যাপ্ট আর আমি তৈরী হয়ে নিলাম। আমি সাজলাম তাঁর চাকর। গোপন একটা দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দা পার হলাম তারপরে রাজউদ্যানের গায়ে লাগা একটা চুপচাপ রাস্তায় এসে পড়লাম। দুটো ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষায় ছিল এক জন অনুচর।

আমরা চললাম।

পুরনো শহরটা পেরোলাম শঙ্কাদুরুদুরু মন নিয়ে। তবে শহরের বাইরে এখন আর ভয় নেই।

চমৎকার রাতটা, আমরা নিঃশব্দে চলেছি। মাইল পঁয়তাল্লিশ চলার পরে স্যাপ্ট হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—শুনুন।

আমাদের পিছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ।

চলে আসুন।—স্যাপ্ট বলেন।

খুব তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালাই।

একটু পরে আবার ঘোড়া থামিয়ে স্যাপ্ট মাটিতে কান পাতেন—দুজন লোক আসছে। এদিকে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে দেখছেন? আমরা ডানদিকে যাব। অন্য রাস্তাটা দুর্গে যাচ্ছে। দুটো রাস্তাই মাইল আস্টেক হবে। নেমে পড়ুন।

—কিন্তু ওরা আমাদের ধরে ফেলবে।

—নেমে আসুন।

অতএব নেমে আসি।

জেণ্ডার বনের মধ্যে প্রবেশ করি। ঘন জঙ্গলে আমরা লুকিয়ে পড়ি।

—কে আসছে দেখতে চান?

—হ্যাঁ, আর কোনদিকে ওরা যাচ্ছে।

একটু পরেই দেখা গেল অশ্বারোহী দুজনকে।

জ্যোৎস্না ছিল, স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

—ওই তো ডিউক।

ডিউকের সঙ্গে একজন লম্বা চওড়া লোক তাকে পরে চিনে ছিলাম। নাম ম্যাক্স হল্ট, জোহানের ভাই।

রাস্তাটা যেখানে ভাগ হয়েছে সেখানে দুজনে থামল।

—কোন দিকে? মাইকেল বললেন।

—দুর্গের দিকে?

—আমরা বাড়িতে যাচ্ছিনা কেন?

—ভয় হচ্ছে একটা ফাঁদ পাতা আছে। যদি সবই ঠিক থাকে তো বাড়িতে যাওয়ার তো কোন কারণ নেই। না হলে ওটা একটা ফাঁদ।

—ঠিক আছে, তাহলে দুর্গেই চল।

ঘোড়াদুটো চলে যাবার পরেও আমরা কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করি।

স্যাপ্ট বল্লেন—তাহলে ডিউককে কেউ খবর পাঠিয়েছে যে সব ঠিক আছে।

—এ খবরের মানে?

—তা জানি না। তবে ডিউক স্ট্রেলসো থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছেন।

তারপর আট মাইল মুখ বুজে ছুটে চললাম। বাগানবাড়িতে পৌঁছে দেখলাম সব চুপচাপ। কেউ আমাদের দেখে এগিয়ে এল না।

হঠাৎ স্যাপ্ট আমার বাহু আকর্ষণ করলেন।

দেখুন?

দেখলাম।

আমার পায়ের কাছে কতগুলো ছেঁড়া রুমাল। বুড়িটাকে যা দিয়ে বেঁধেছিলাম, স্যাপ্ট বলেন। দৌড়ে মদ রাখার জায়গাটা গেলাম।

দরজা খোলা।

—বুড়িটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে।

—রুমালগুলো দেখেই বুঝেছিলাম। স্যাপ্ট বলেন। কিন্তু জোসেফ কই? রাজা কোথায়?

আশঙ্কায় স্যাপ্ট ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারছেন না।

গিয়ে কী দৃশ্য দেখবেন কে জানে।
আমিই একটা আলো জ্বাললাম।
উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ, গলাটা কাটা—চার পাশে শুকনো রক্ত।
পাশে গিয়ে বসে পড়ি। বেচারা জোসেফ।
স্যাপ্ট আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন—
হায় ভগবান, রাজা কোথায়?
তন্নতন্ন করে জায়গাটা খুঁজি।
রাজা এখানে নেই।

* * *

আত্মসংবরণ করতে স্যাপ্টের ঠিক দশমিনিট সময় লাগে।
এখন রাত একটা।
—ওরা রাজাকে বন্দী করেছে।
—হ্যাঁ। আমি বলি—সব ঠিক আছে। খবরের মানে হচ্ছে এই। তাই মাইকেল রাগে খেপে উঠে ছিল তখন।
উঠে দাঁড়াই।
—আমাদের এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে। স্ট্রেলসোর সৈন্যদের জাগাতে হবে। মাইকেলকে ধরিয়ে দিতে হবে।
বুড়ো স্যাপ্ট ধীরভাবে পাইপ ধরালেন।
আমি আবার বলি—আমরা এখানে বসে থাকলে রাজা খুন হয়ে যাবেন।
—ওই হতভাগী বুড়িটা। কোনরকম করে লোকজন জড় করেছিল নিশ্চই। রাজাকে ওষুধ খেয়ে অসুস্থ জেনে ওরা ধরে নিয়ে যেতেই এসেছিল। আমরা তিনজন স্ট্রেলসোয় না গেলে খুনই হয়ে যেতাম।
—আর রাজা?
—কে জানে তিনি কোথায়?
—চলুন। চেঁচিয়ে উঠি।
স্যাপ্টের মুখে দেখা দেয় বিচিত্র এক হাসি।
—হ্যাঁ চলুন। রাজা কাল তাঁর রাজধানীতেই থাকবেন।
—রাজা?
—হ্যাঁ, অভিষিক্ত রাজা।
—আপনি পাগল।
—এখন যদি আমরা ফিরে গিয়ে আমাদের কীর্তির কথা বলি, আমাদের কে বেঁচে থাকতে দেবে? আর সিংহাসন? লোকেরা এভাবে বোকা বনেছে শুনলে কী খুব খুশী হবে। তাদের রাজা মাতাল হয়ে এক ভৃত্যকে পাঠিয়েছে তার বদলে অভিষিক্ত হতে একথা শুনলে কী করবে তারা?
—রাজা পাগল হননি, বিষ দেওয়া হয়েছে তাঁকে—আর আমিও তার ভৃত্য নই।
খুব রেগে গিয়েছি।
—মাইকেল যা বলবে তাই শুধু বলছি। ভাই, এখনও যদি তোমার সাহস থাকে, রাজাকে বাঁচাতে পারবে। তাঁর সিংহাসনটা বাঁচাও।
কিন্তু ডিউক সব জেনে গেছেন। তার লোকেরাও জানবে।
—হ্যাঁ, কিন্তু কিছু বলতে পারবে না। কী করে বলবে, নিজেদের কীর্তি প্রকাশ না করে?
এবার ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে। মাইকেল আমাকে চিনলেও কিছু বলতে পারবে না। কারণ তাহলে তাকে আসল রাজাকে বাইরে আনতে হবে। আর রাজাকে বার করলে তার কী হবে?
কিন্তু অন্য অসুবিধাও আছে।
বলি—আমি ধরা পড়ে যেতে পারি।
—হয়তো। কিন্তু এখন প্রতিটি মুহূর্তের দাম আছে। সবচেয়ে বড় কথা এখন স্ট্রেলসোতে এক-জন রাজা থাকা চাই। নাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে

মাইকেলের হাতে চলে যাবে শহরটা তখন রাজার দশা কী হবে ?

—হয় তো এখনই তাঁকে খুন করছে। তাহলে কী হবে, স্যাপ্ট ?

—তুমি স্ট্রেলসোয় গেলে ওরা তা করবে না। তুমি থাকলে রাজাকে মেরে ওদের লাভ ?

এটা একটা পাগলের প্ল্যান। প্রথম প্ল্যানটার চেয়েও আজগুবী। কিন্তু এখন অন্য কিছু করার নেই।

তাছাড়া, আমি যুবক। যৌবন অ্যাডভেঞ্চারকে ভালোবাসে।

—স্যাপ্ট আমি যাব !

—ভাল কথা। তাহলে এখুনি যাওয়া যাক।

—জোসেফকে করব দিতে হবে।

—সময় নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার যদি ইচ্ছে হয়। আমি ঘোড়া আনতে যাচ্ছি।

জোসেফকে তুলে নিয়ে আসছি, এমন সময়ে স্যাপ্ট দরজায় এসে দাঁড়ালেন।—ওকে নামিয়ে রাখ এই কাজ করবার জন্যে লোক আসছে।

স্যাপ্ট আমায় জানলার কাছে নিয়ে গেলেন। তিনশ গজ আন্দাজ দূরে আটজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। কারও কারও হাতে কোদাল।

মাইকেলই তাদের পাঠিয়েছে।

বলি—কর্নেল, ওদের ওপর শোধ নেওয়া উচিত। ব্যাপারটা বিপজ্জনক, মহারাজ। তবু যাই হোক, এখন মরে গেলে অনেক ভাবনা কমে যাবে। এস একটা লড়াই করার জায়গা দেখিয়ে দিই।

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠি।

—রিভলবার ঠিক আছে।

—না, আমার তলোয়ারই ভাল।

স্যাপ্ট হাসেন—বেশ।

যেই লোকগুলোর আসার শব্দ পাই তলোওয়ার খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পরে স্যাপ্টের কাছে শুনেছিলাম তিনি একজনকে খুন করেছেন।

আমি একজনের মাথা ফাটালাম, আরেকজনের বুকে চাপিয়ে দিলাম অস্ত্র। কানের পাশ দিয়ে গুলি ছুটে গেল। স্যাপ্ট এগিয়ে গেছেন কুড়ি গজ সামনে। আমি হাত নেড়ে এগোতে যাই, হাতে এসে লাগে বুলেট, ঝরে রক্ত।

ইতি মধ্যে আমরা বহু দূরে চলে এসেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিরাপদেই ফিরে এলাম প্রাসাদে।

আটটা বেজে গেছে, কিন্তু বেশী লোকের দেখা পাই নি, আর বেশ করে মুড়ি দিয়েই বসেছিলাম আমি। নিজের ঘরে ঢুকে দেখি ফ্রিট্‌জ একটা সোফায় জামা-কাপড়-পরে শুয়ে আছেন।

আমাদের দেখেই লাফিয়ে উঠলেন।

—ভগবানকে ধন্যবাদ—আপনারা নিরাপদে আছেন।

আমার হস্ত চুম্বন করে ফ্রিট্‌জ।

স্যাপ্ট, সেই নিষ্ঠুর বৃদ্ধ, হেসে ওঠেন।

—এই ঠিক হয়েছে।

ফ্রিট্‌জ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বসে পড়লেন। জানতে চাইলেন—রাজা কোথায়?

—আস্তে, অত চেঁচিও না। স্যাপ্ট বলেন—এই তো রাজা—তোমার সামনে।

ফিসফিসিয়ে বল্লেন—মাইকেল তাকে ধরেছে। তবে মনে হয় বেঁচে আছেন।

অতএব ঘুম থেকে ওঠবার ভান করি। নিয়মমত ব্রেকফাস্ট খাই। তারপর স্যাপ্টের কাছ থেকে জেনে নিই আমার সারা দিনের কর্তব্য।

রাজার জীবন তো দুঃখের বটেই তবে নকল রাজার জীবন আরও বেশী তাই।

চ্যান্সেলর কাগজ পত্র সই করাতে এলেন। আমার আঙুলটা কাটা বলে অন্যধরনের সই নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। কয়েকজন রাজদূতের সঙ্গেও দেখা করতে হল। বড় খাটনির দিন।

শেষ পর্যন্ত আবার আমরা তিনবন্ধু একত্র হলাম।

ভাবতে বসি এবারে কী করব।

ফ্রিট্‌জ বলেন—এখুনি আমাদের মাইকেলকে ধরা উচিত।

—আস্তে, আস্তে। মাইকেল কী তাহলে রাজাকে জ্যান্ত ছেড়ে দেবে? স্যাপ্টের উত্তর।

—কী করব তবে?

—বোকার মত কিছু তো করব না।

আমার মনে হয়—আমি আর মাইকেল যেন পরস্পরের দিকে রিভলবার তাক করে আছি। কেউই নড়ছি না। তবে মাইকেল কিছু করলেও করতে পারে। তাতে তারই লাভ।

ফ্রিট্‌জ জানান—মাইকেলের কুখ্যাত ছয়জন অনুচরের তিনজন স্ট্রেলসোয় আছে।

—মাত্র তিনজন? তাহলে বাকী তিনজন জেণ্ডায়, রাজাকে পাহারা দিচ্ছে। রাজা বেঁচে আছেন।

—ঠিক বলেছেন, রাজা না থাকলে ছজনই এখানে থাকত। মাইকেল ফিরে এসেছেন। জানেন তো?

জানতে চাইলাম এই ছজন কারা।

স্যাপ্ট গম্ভীর ভাবে বললেন শীগগিরই আমি তাদের দেখতে পাব। তারা মাইকেলের জন্য সব কিছু করতে পারে। তিনজন এদেশী হলেও একজন ফরাসী একজন ইংরেজ আর একজন বেলজিয়ানও আছে তাদের মধ্যে।

—মাইকেল বললে তারা এক্ষুনি যে কোন লোকের গলা কেটে দিতে পারে।

—এখানে কে কে আছে ফ্রিট্‌জ?

—বারসনিন, দ্য গতে আর ডেশার্ড।

—অর্থাৎ বিদেশী লোকেরা। তারমানে এখানকার বাসিন্দারা রাজাকে পাহারা দিচ্ছে—অর্থাৎ পরে মাইকেলকে কেউ দোষ দিতে পারবে না।

ভেবেই রেখেছিলাম জনতার কাছে নিজেকে খুব প্রিয় করে তুলব। তাই ফ্রিট্‌জকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেলাম, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম, তারপর

এলাম ফ্লেভিয়ার বাড়িতে। বাইরে জনতা হর্ষে চিৎকার করে উঠল।

চ্যান্সেলর আমায় বলেছিলেন লোকেরা একটা বিয়ের এনগেজমেণ্টের অপেক্ষায় আছে।

রাজকুমারী তো খুবই জনপ্রিয় তাই ভাবলাম তার বাড়িতে একবার গেলে লোকেরা খুশীই হবে। ফ্রিট্‌জও খুবই খুশী। তিনি আরও খুশী রাজকুমারীর সখী কাউণ্টেস হেলগাকে দেখতে পেয়ে।

অবশ্য অভিনয়টা চালাতে আমার খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। রাজকুমারীর সঙ্গে প্রেমের ভান করতে হবে অথচ প্রেমে পড়া চলবেনা।

খুবই মুস্কিল, বিশেষত রাজকন্যা এত সুন্দরী।

ফ্লেভিয়া বললে—তোমার পরিবর্তন দেখে খুব খুশী হয়েছি রুডল্‌ফ। শেক্সপীয়ারের সেই রাজপুত্রের মত রাজা হয়েই বদলে গেছ। তোমার মুখটাই কেমন বদলে গেছে।

বিষয়টা বিপদজনক। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটাই।

—আমার ভাই ফিরে এসেছে শুনলাম।

—হ্যাঁ।

বুঝলাম ফ্লেভিয়া মাইকেল আসাতে খুশী হয় নি।

—ভালই তো। যত কাছে থাকে ততই ভাল।

ফ্লেভিয়া বলে –তার মানে ?

—তাহলে আমরা জানতে পারব সে কী করছে না করছে। তুমি খুশী হয়েছ কেন ?

—কে বললে আমি খুশী হয়েছি। মাইকেলের জন্যে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই।

এমন সময় বাইরে হর্ষধ্বনি উঠল। রাজকুমারী ছুটে গেলেন জানলায়।

বলে উঠলেন—এসেছে। ডিউকই এসেছে।

বাইরের ঘরে শব্দ ওঠে নানারকম। আমি কথাবার্তা চালিয়েই যাই।

একটু পরে ফ্লেভিয়া বলে

—তুমি কী মাইকেলকে রাগাতে চাও ?

—কেন, রাগাতে চাইব কেন ?

—তাকে এমনি করে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ ?

—আমিতো আটকাই নি ?

—সে ভেতরে আসবে ?

—নিশ্চয়ই, তোমার যদি ইচ্ছে হয়।

ফ্লেভিয়া অবাক হয়ে তাকাল।

—তুমি জান তুমি যতক্ষণ এখানে আছ আর কেউই আসতে পারে না।

বাঃ, ভারী চমৎকার তো। রাজা হওয়ার এমনি মজা। ফ্রিট্‌জের বলে দেওয়া উচিত ছিল।

তাড়াতাড়ি মাইকেলকে ডেকে আনি।

মাইকেল গম্ভীরভাবে আমায় ধন্যবাদ দেয়। লোকটির হয়তো অনেক গুণ আছে, কিন্তু মনের ভাব গোপন করার ক্ষমতা তার নেই।

মাইকেল এখন জানে আমি রাজা নই, কিন্তু সে যে জানে এই কথাটা আমার কাছে গোপন করতে চায়।

বলে—মহারাজ আপনার হাত কেটে গেছে।

—হ্যাঁ। একটা কুকুরের সঙ্গে খেলা করছিলাম, কামড়ে দিয়েছে।

মাইকেল আমার ইঙ্গিত বোঝে, বিদ্বেষের হাসি হাসে।

ফ্লেভিয়া চিন্তিত হয়।

—কামড়ে কোন ভয় নেই তো?

বলি—এই কামড়টায় নয়। তবে আবার যদি কামড়াতে দিই বিপদ হতে পারে।

ফ্লেভিয়া জানতে চায় কুকুরটাকে মেরে ফেলা হয়েছে কী না।

বলি—এখনও না। দেখছি ওর কামড়টা বিষাক্ত কী না।

মাইকেল বলে ওঠে—আর যদি বিষাক্ত হয়?

—তাহলে তার মাথাটা গুড়ো করে দেওয়া হবে, ভাই।

তারপর মাইকেলের সুন্দর ব্যবস্থা, অভিষেকের আয়োজন ইত্যাদির প্রশংসা করি। বুঝতে পারি মাইকেলের সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে।

সে উঠে দাঁড়ায়।

আমার তিনজন বন্ধু মহারাজের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। তারা বাইরের ঘরে আছে।

তাকে দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

তার মুখ দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল।

বাইরের ঘরে এসে মাইকেল লোকতিনটিকে ডাকে। তারা একে একে আমার হস্তচুম্বন করে—দ্য গোতে —ফরাসী, লম্বা রোগা লোক, মুখে মস্ত গোঁফ; বারসনিন বেলজিয়ান, মোটাসোটা নাতিদীর্ঘ আর ডেশার্ড জাতে ইংরেজ, লম্বা মুখ ও হাল্কারঙের চুল।

লোকটা ভাল যোদ্ধা সন্দেহ নাই কিন্তু ঘোর মিথ্যাবাদী। বিদেশী উচ্চারণে ইংরেজী বললাম, মনে হল ডেশার্ড ভেতরে ভেতরে হাসছে।

তাহলে লোকটা সব জানে।

ওরা চলে গেলে রাজকুমারীর কাছে বিদায় নিলাম। সে বলে—রুডলফ্ খুব সাবধানে থাকবে তো?

—কেন?

—তা জানি না। মনে রেখো তোমার জীবনের দাম কতখানি।

—কার কাছে?

—কেন রুরিটানিয়ার কাছে।

আবার অভিনয় করি। বলি—

—শুধু রুরিটানিয়ার কাছে?

তার মুখ লাল হয়।

—তোমার বন্ধুদের কাছেও।

—বন্ধুদের?

—তোমার এই কাজিনের কাছেও

তার হস্তচুম্বন করে বেরিয়ে আসি।

ফ্রিট্জ হেলগার সঙ্গে সোফায় বসে আছে।

আমাকে দেখেই লাফিয়ে ওঠে।

আমারা ফিরে আসি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কেটে গেল কয়েকটা দিন।

আমার রহস্যটা বেশ গোপন রয়েছে। যদিও মাঝে মাঝে আমি ভুল করে ফেলেছি দু একটা।

তবু ভাগ্যের জোর, কেউই ধরতে পারে নি আমি রাজা নই।

একদিন স্যাপ্ট আমার ঘরে এলেন।

একটা চিঠি ছুড়ে দিলেন টেবিলের ওপর।

—আপনার চিঠি। মেয়েদের হাতের লেখা। আরেকটা বড় খবর, রাজা জেণ্ডার দুর্গেই আছেন।

—কী করে জানলেন?

—কারণ মাইকেলের বাকী তিনজন অনুচর সেখানেই আছে। ল্যাভেনগ্রাম, ক্র্যাফস্টাইন আর রুপার্ট হেনশো। তিনটে শয়তানই ওখানে।

উড়াল সেতুটা ওঠানো আছে—কাউকে ভেতরে

যেতে দেওয়া হচ্ছে না—যতক্ষণ না মাইকেল বা রুপার্ট অনুমতি দিচ্ছে।

—আমি জেণ্ডায় যাব।—বলে উঠি।

—এখনও নয়। সাবধানে থাকতে হবে। খোলা-খুলি আক্রমণ করলেই রাজাকে খুন করবে ওরা। ওই চিঠিটায় কী আছে?

পড়লাম চিঠিটা—।

লেখা আছে—

মহারাজ যদি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর জানতে চান তবে রাত্রি বারোটায় একা নিউ অ্যাভিনিউএর শেষ বাড়িটায় আসুন। বাগানের পিছনের ছোট গেটটা খুলে ডানদিকে কুড়িগজ হাঁটলেই ছোট একটা গ্রীষ্মাবাস দেখতে পাবেন, এই গ্রীষ্মাবাসেই একজন তাঁর অপেক্ষা করবে। এই চিঠির আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে তাঁর জীবনের আশঙ্কা আছে। আর এই চিঠি কাউকে দেখাবেন না। বিশ্বস্ত এক মহিলার ক্ষতি করবেন তাতে। মাইকেল কাউকে ক্ষমা করে না।

শুনে স্যাপ্ট বললেন—বা ও বেশ সুন্দর একটা চিঠি লিখিয়েছে তো মাইকেল।

চিঠিটা ছেঁড়া কাগজের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে যাব, হঠাৎ চোখে পড়ল এর উল্টো পিঠটা।

সেখানেও লেখা আছে—

যদি সন্দেহ হয়, কর্নেল স্যাপ্টকে জিজ্ঞাসা করবেন কোন্ মহিলা ডিউককে ফ্লেভিয়াকে বিবাহ করতে বাধা দিতে চান, আর সেই জন্যে সিংহাসন লাভেও বাধা দিতে চান? তার নামের আদ্যক্ষর হচ্ছে 'এ'।

লাফিয়ে উঠলাম।

চিঠির লেখিকা আঁতোয়নেত দ্য মবান।

স্যাপ্ট বলেন—কী করে জানলেন।

মহিলাটি সম্বন্ধে যা শুনেছি বললাম।

স্যাপ্ট বলেন—হ্যাঁ, মাইকেলের সঙ্গে তার বিবাদ আছে বটে।

—মেয়েটি আমাদের কাজে লাগতে পারে।

—অবশ্য মাইকেলই চিঠিখানা লিখিয়েছে।

—মনে হচ্ছে, তবু নিশ্চিত জানতে চাই। আমি যাব।

—না আমি যাব। স্যাপ্ট বলেন

—আপনি গেট পর্যন্ত আসতে পারেন।

—আমি গ্রীষ্মাবাসে যাব

বলি—স্যাপ্ট, মেয়েটির কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে। আমি যাব

—আমি বিশ্বাস করি না। অতএব আপনি যাবেন না।

—হয় আমি ওখানে যাব নয় তো ইংলণ্ডে ফিরে যাব।

এতদিনে স্যাপ্ট জেনে গিয়েছেন কত দূর পর্যন্ত আমাকে চালানো যায়।

তিনি বল্লেন—ঠিক আছে।

রাত সাড়ে এগারোটর সময় স্যাপ্ট আর আমি তৈরী হয়ে নিলাম। ফ্রিট্‌জ রইলেন পাহারায়।

ঘুট ঘুটে রাত—ছোট একটা লণ্ঠন হাতে একটা ছুরি, আর রিভলবার।

গেটের বাইরে পৌঁছলাম।

স্যাপ্ট বললেন। এখানেই রইলাম। গুলির আওয়াজ পেলেই হাজির হব।

—আপনি এখানেই থাকুন। রাজাকে বাঁচাবার এই একমাত্র উপায়। আপনিও খুন হলে কী হবে।

—ঠিক বলেছেন।

নিঃশব্দে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকি।

ডানদিকে এগোই, হাতে রিভলবার।

গ্রীষ্মাবাসটা দেখতে পেলাম।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাই।

একটি মহিলা ছুটে এসে আমার হাত ধরেন।

দরজা বন্ধ করে দিন।

বন্ধ করে দিই। আলোটা ঘোরাই তাঁর দিকে।

হ্যাঁ আঁতোয়ানেত—খুব সুন্দর সেজেছেন তিনি।

ঘরে মাত্র দুয়েকটা চেয়ার আর একটা ছোট লোহার টেবিল।

তিনি বলেন—কথা বলবেন না। মোটেই সময় নেই। আমি আপনাকে চিনি মিস্টার র‍্যাসেনডিল। ডিউকের হুকুমে আমি চিঠিটা লিখেছিলাম।

—জানি।

—কুড়ি মিনিটের মধ্যে তিনটে লোক আপনাকে মারতে আসবে।

—সেই তিনজন?

—হ্যাঁ। তার আগেই আপনাকে যেতে হবে। না হলে মারা পড়বেন।

—তারাও মরতে পারে।

—শুনুন, আপনাকে মেরে আপনার শরীরটা নিয়ে যাওয়া হবে শহরের একটা নীচুজায়গায়। সেখানে দেহটা পাওয়া যাবে। মাইকেল অমনি আপনার বন্ধু স্যাপ্ট আর ফ্রিট্‌জকে বন্দী করবেন, শহরে সামরিক শাসন আনবেন। আর অমনি জেণ্ডাতুর্গে রাজাকেও খুন করা হবে। তারপর সে নিজে রাজা হবে, ফ্লেভিয়াকে বিয়ে করবে।

—সুন্দর প্ল্যান।

—আমার এই কাজের কারণ যা খুশীমনে করতে পারেন—ঈর্ষা, বা যাহোক। কিন্তু মনে রাখবেন আপনি নিরাপদ নন। আপনার সঙ্গে রক্ষী আছে।

—হ্যাঁ, স্যাপ্টের প্ল্যান এটা।

—আচ্ছা। জেনে রাখুন। মাইকেলের তিনজন অনুচর সবসময় আপনার ওপর নজর রাখছে। এখন যান। গেট দিয়ে নয়। এই দিকে দেয়ালে একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে পালান।

বলি—ম্যাডাম, রাজার অনেক উপকার করেছেন আপনি। দুর্গের কোনখানে আছেন তিনি?

ফিসফিসিয়ে উত্তর এল।

—সেতুর ওপারে একটা ভারী দরজা। তার পেছনে

—ওই শুনুন।

বাইরে পদশব্দ।

—ওরা আসছে। আলো নেভান।

সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে দিই।

দরজার ফুটো দিয়ে তিনজনকে দেখা গেল। আঁতোয়ানেত আমার রিভলবার চেপে ধরে।

—একজনকে মারতে পারেন। তার পরে ?

বাইরে থেকে কে বলে—মিস্টার র‍্যাসেনডিল ? উত্তর দিই না।

—আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। গুলি করবেন না, কথা দিন !

—মিস্টার ডেশার্ডের সঙ্গে কী কথা বলছি ?

—নাম জিগ্যেস করবেন না।

—তবে আমারও নাম ধরবেন না।

—ঠিক আছে মহারাজ। একটা প্রস্তাব আছে।

তিনজন দরজার কাছে উঠে এসেছে। হাতে রিভলবার।

—ঢুকতে দেবেন আমাদের। কথা দিচ্ছি গুলি ছুড়ব না।

আঁতোয়ানেত বলেন বিশ্বাস করবেন না।

বলি—দরজার ফাঁক দিয়ে কথা বলুন।

—দরজা খুলে গুলি করবেন না তো ?

—আপনারা না করলে করব না। বলুন।

—ঠিক আছে।

এবার দেখি ওরা দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝলাম আমি কথা বলব বলে অন্যমনস্ক হলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বলি—ঠিক আছে বলুন আপনাদের প্রস্তাব।

—আপনাকে সীমান্ত পার করে দেওয়া হবে নিরাপদে আর দেওয়া হবে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।

—ভালোই তো মনে হচ্ছে। এক মিনিট ভাবতে দিন।

আঁতোয়ানেতের দিকে ফিসফিসিয়ে বলি—দরজা

—ঘেঁষে দাঁড়ান—যাতে আপনার গায়ে গুলি না লাগে।

তারপর লোহার টেবিলটা তুলে নিই।

আমার পক্ষে ওটা তেমন ভারী না, পা গুলোধরে ঢালের মত ব্যবহার করি। লণ্ঠনটা বন্ধ করে

কোমরে বেঁধে নিই—রিভলবরটা পকেটে। ঘরের কোনায় পিছিয়ে যাই।

চেঁচিয়ে বলি—ঠিক আছে। আপনাদের প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি। এখন যদি দরজটা খোলেন—

—আপনি খুলুন, বলে ডেশার্ড।

—ওটা বাইরের দিকে খোলে। আপনারা একটু পিছিয়ে দাঁড়ান।

খুলবার ভান করি। তারপর আবার পিছিয়ে যাই।

খুলছে না। বাইরে থেকে টানুন।
ডেশার্ড চেঁচিয়ে ওঠে—আমি খুলছি। কী হে, তোমরা একটা লোককে এত ভয় পাচ্ছে কেন?
একটু পরেই দরজাটা খুলে যায়।
সঙ্গে সঙ্গে ওদের দিকে ধেয়ে যাই।
তিনটে রিভলবারই গর্জে ওঠে। কিন্তু আমার ঢাল আমায় বাঁচায়।
পরমুহূর্তেই আমার টেবিলের ধাক্কায় হুড়মুড়িয়ে পড়ে সবাই।
আঁতোয়ানেতা চেঁচিয়ে ওঠেন—কিন্তু আমি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াই।
দু গোতে আর বারসেনিন পড়ে আছে। ডেশার্ড টেবিলের নীচে, আমি উঠে দাঁড়াতেই ও ঠেলে ওঠে।
গুলি চালাই।
তারপর প্রাণপণে ছুটে বেরিয়ে যাই।
সিঁড়িটা দেখতে পেয়েছি। বাইরে গিয়ে ঘোড়াদুটো আর স্যাপ্টকে পেলাম। প্রাণপণে গেটের মধ্যে গুলি চালাচ্ছেন তিনি।
—চলে আসুন।
—ভাল আছেন। হাসছেন কেন?
—চায়ের টেবিলের চার পাশে চারজন লোক। আমি এখনও হাসছি।
একটা চায়ের টেবিল দিয়ে তিনজন ভয়ংকর শত্রুকে প্রতিহত করা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরেরদিন গোপন পুলিশ বাহিনীর কাছে জানতে পারলাম মাইকেল আর তিনজন অনুচর স্ট্রেলসো ছেড়ে চলে গেছে। ডেশার্ডের একটা হাতে ব্যাণ্ডেজ।
তার মানে আমার গুলিটা ওর গায়ে লেগেছিল।
আঁতোয়ানেতও চলে গেছে।
জেণ্ডাতেই নিশ্চয় গেছে ওরা।
পুলিশ রিপোর্টে আরও দেখলাম:
"বিয়ের ব্যাপারে না এগোনোর জন্যে লোকেরা রাজাকে দোষ দিচ্ছে। রাজকুমারীও মনে মনে দুঃখিত। অনেকে আবার ডিউকের সঙ্গেও তাঁর নাম জুড়ে দিচ্ছে।"
ফ্রিট্জ বললেন—কথাটা ঠিক। কাউন্টেস হেলগা আমায় বলেছেন ফ্লেভিয়া রাজাকে ভালোবাসেন।
—খুব হয়েছে! চেঁচিয়ে বলি।
স্যাপ্ট বলেন—রাজাকন্যার সম্মানে আজ রাত্রে একটা নাচের আয়োজন করেছি।
—আমি তো জানতাম না।
ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না।
স্যাপ্ট আমাকে ধমকে বলেন—আজ রাতে দেখা হলে রাজকুমারীকে বিয়ের কথা বলবেন।
—হে ভগবান!
—মেয়েদের মিষ্টি কথা বলার অভ্যেস নিশ্চয়ই আছে। ফ্লেভিয়া শুধু সেইটুকুই চায়।
—আমি পারব না। রাজকন্যাকে বোকা বানাতে পারব না।
স্যাপ্ট চোখ পিটপিটিয়ে হাসেন—ঠিক আছে। জোর করব না। তবে মিষ্টি করে কথা বলবেন। উনি যেন রাজার উপর রেগে না যান।
ফ্রিট্জের সঙ্গে বাগানে ঘুরে বেড়াই।
বেশ বুঝেছি কেন শেষপর্যন্ত স্যাপ্ট থেমে গেলেন। ফ্লেভিয়ার পৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে আমি আপনিই ওসব কথা বলে ফেলব। স্যাপ্ট নিশ্চই জানেন এতে শেষপর্যন্ত ফ্লেভিয়ার দুঃখ হবে কত, কিন্তু তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। রাজাকে বাঁচানো

গেলে ফ্লেভিয়াকে তাঁকে বিয়ে করতে হবে, সে আমার কথা জানুক আর নাই জানুক। রাজাকে না পাওয়া গেলে স্যাপ্ট মাইকেলের বদলে আমাকেই রাজা সাজিয়ে রেখে দেবেন।

নাচটা খুব জব্বর জমেছিল। অত সুন্দর একটি মেয়ের সাহচর্যে কী করে ঠাণ্ডা থাকা সম্ভব···

সকলের চোখের সামনে রুরিটানিয়ার রক্ত গোলাপ নিজের গলা থেকে খুলে নিয়ে তাকে পরিয়ে দিলাম। হর্ষধ্বনি উঠল।

স্যাপ্ট হাসলেন, ফ্রিট্‌জ ভ্রূ কুঁচকোলেন।

নাচ শেষ হয়ে গেলে রাজকন্যার সঙ্গে ছোট একটা ঘরে একা হলাম। সে বসে, আমি সামনে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ ফ্লেভিয়া আমার দিকে তাকাল।

ব্যস্ সব গোলমাল হয়ে গেল আমার। সব ভুলে গেলাম।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম তার সামনে, হাতের মধ্যে নিলাম তার হাত।

কিছুই বলতে হল না।

হঠাৎ ফ্লেভিয়া ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে।

—এটা কী সত্যি?

—সত্যি ফ্লেভিয়া। তোমাকে ভালবাসি—জীবনের চেয়ে, সত্য, সম্মানের চেয়েও।

ফ্লেভিয়া আমার কথার অর্থ ধরতে পারল না।

—কী আশ্চর্য জানো রুডল্‌ফ, এতদিনে তোমায় ভালবাসছি।

—এতদিনে?

—হ্যাঁ। আগে বাসতাম না।

মনের মধ্যে একটা জয়ের অনুভূতি। তাহলে রুডল্‌ফ র‍্যাসেনডিলকেই ভালোবাসছে সে।

—আগে ভালবাসতেন না?

—নিশ্চয়ই তোমার মুকুটটার জন্যে। তোমায় প্রথম ভালবাসলাম অভিষেকের দিন।

বলি—ও, ফ্লেভিয়া, যদি আমি রাজা না হতাম—

—তুমি যেই হতে তোমায় ভালবাসতাম।

বলতে থাকি—গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমার—ফ্লেভিয়া—আমি—

এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং স্যাপ্ট এলেন। আমার কথা শেষ হল না।

স্যাপ্ট ঝুঁকে অভিবাদন করলেন।

—মহারাজ কার্ডিনাল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তাঁর চোখে দেখলাম ক্রুদ্ধ সাবধান বাণী। কতক্ষণ ধরে আমাদের কথা শুনছেন জানি না।

বল্লাম—চলুন।

ফ্লেভিয়া বলে – কর্নেল স্যাপ্ট, আজ আমি বড় সুখী। ফ্লেভিয়ার কথা বুঝতে স্যাপ্টের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। মনে হল এই বৃদ্ধের চোখেও কোমলতা দেখলাম। তিনি ওর হস্তচুম্বন করলেন – আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আবার নাচের ঘরে ফিরে যাই।

সবাই বিদায় অভিবাদন জানায়। স্যাপ্ট হাসিমুখে ফিসফিস করে বেড়াচ্ছেন। সবাইকে উনি কী বলছেন জানি। চতুর বৃদ্ধটি ফ্লেভিয়ার প্রতি আমার মনোযোগের কাহিনী শোনাচ্ছেন। শুধু মাইকেলকে হারানো আর সিংহাসন অধিকার করে রাখা—এছাড়া তাঁর জীবনে আর কিছু নেই। এখন, এসব খবর তো বাতাসের আগে চলে।

যখন ফ্লেভিয়াকে গাড়িতে ওঠাতে পেলাম—দেখলাম বিশাল জনতা। আমাদের দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

কী আর করব—স্যাপ্টের চালাকি, আর আমার আবেগ—এই দুই কারণে ধরা পড়ে গেছি।

পরে—তখন প্রায় সকাল—ফ্রিট্জ আর স্যাপ্টের সঙ্গে একলা হলাম।

স্যাপ্টকে বললাম—অপনি আমার সম্মানে আঘাত করেছেন। আমি আর অপরাধী হতে চাই না। চলুন জেণ্ডায় গিয়ে রাজাকে উদ্ধার করে আনি।

—আপনি যদি চেষ্টা করেন—

—আমি যদি চেষ্টা করি রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারি। আপনি শতচেষ্টা করলেও তা বন্ধ করতে পারবেন না। আপনার গল্প কে বিশ্বাস করবে?

—জানি।

তাহলে, কবে জেণ্ডায় যাচ্ছি?

স্যাপ্ট আমার হাতে ধরলেন—ভগবান। আপনি তো দেখছি সবার সেরা এলফ্‌বার্গ। কিন্তু আমি যে রাজভক্ত। চলুন আমরা জেণ্ডাতেই যাই।

দ্রুত প্ল্যান করা হল। সেনাপতিকে বুঝিয়ে রাখলাম রাজা যদি হঠাৎ মারা যান কী কী করতে হবে।

তিনি বল্লেন - ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। বিপজ্জনক কোন কাজে যাচ্ছেন কী?

ফ্লেভিয়াও দেখলাম আমার শিকারে যাওয়ার কাহিনী শুনেছে।

সে গম্ভীর ভাবে বলল—স্ট্রেলসোতে যথেষ্ট আনন্দের অভাব হচ্ছে দেখে বড় দুঃখ হচ্ছে আমার। ভেবে-ছিলাম কাল রাত্রের পরে অন্তত—

—হাঁ?

—অন্তত এখুনি তোমার কোন প্রমোদের দরকার হবে না। শুনলাম শুয়োর মারতে যাচ্ছ তাই তোমার ভাল লাগবে।

একফোঁটা জল পড়লো ফ্লেভিয়ার গাল বেয়ে।

বললাম—তুমি বিশ্বাস করছ শুধু শিকার খেলার জন্যে তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি?

—তাহলে কী?

—শিকার বটে। তবে শুয়োরটা মাইকেল। ওর মুখ সাদা হয়ে গেল।

—ও, রুডল্‌ফ, কবে ফিরবে?

—জানি না।

—তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

—হ্যাঁ, মরবার আগে তোমায় নিশ্চয় দেখতে আসব।

—তার মানে?

কিন্তু ওকে কিছুই খুলে বলতে পারলাম না। কী করে বলব।

বলি—পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়ের কাছে কে না ফিরে আসে ?

হাজার মাইকেলও আমায় ধরে রাখতে পারবে না।

ফ্লেভিয়া একটু সান্ত্বনা পেল।

কেউ তোমায় আমার থেকে দূরে রাখতে পারবে না ?

—না, ফ্লেভিয়া।

কিন্তু আমাদের মাঝখানে মাইকেল নয়, আরেকজন আছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘোড়ায় উঠি।

পরদিন ট্রেনে চেপে যাত্রা করি আমি ফ্রিট্‌জ স্যাপ্ট এবং বাছাই কয়েকজন লোকের সঙ্গে।

তারা কিছু কিছু কথা জানে। যেমন গ্রীষ্মাবাসের ঘটনা, মাইকেলের সিংহাসনের লোভ, ইত্যাদি। রাজার এক বন্ধুকে মাইকেল আটকে রেখেছে এও জানে। শিক্ষিত এই তরুণেরা আর কিছু জানতে চায় না। তারা আমৃত্যু রাজার কাজ করবে।

প্রথমে টার্লেনহাইমের দুর্গে যাই—ফ্রিট্‌জের কাকা তার মালিক। জেণ্ডা থেকে পাঁচ মাইল দূরে—মাইকেলের দুর্গের উলটো দিকে পাহাড়ের ওপরে এই দুর্গ—চারপাশে অসংখ্য বুনো শুয়োর।

মাইকেল অবশ্য ওই শিকারের গল্প শুনে বোকা বনবে না। সে জানে আমরা কেন এসেছি। আমাদের প্রাণপণে বাধা দেবে ও।

সবচেয়ে বড় কথা আমাদের কাজ করতে হবে গোপনে। রাজা হবার এটা সবচেয়ে বড় মুস্কিল। আমরা চাই রাজাকে জীবিত উদ্ধার করতে। জোর চলবে না। কৌশল চাই। তবে মাইকেল আমাকে মারার আগে রাজাকে মারবে না।

তাছাড়া সে হয়তো ভাবছে সিংহাসন আঁকড়ে থাকার জন্যেই আমি এসব করছি। ভাবছে আমি রাজাকে খুন করতে চাই। সুতরাং আমাকে বাধা দিতে সে ওই হতভাগ্য লোকটিকে জীইয়েই রাখবে।

আবার জেণ্ডায় এসে পৌঁছলাম আমরা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাইকেল আমার সব খবরই রাখে।

জেণ্ডায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক পাঠালে অভ্যর্থনার জন্যে। সেই খুনে তিনটেকে নয়, বাকী তিনজনকে। রুরিটানিয়ার লোক ল্যাভেনগ্রাম, ক্র্যাফটশাইন আর হেনটশোকে। রুপার্ট—বয়স তাঁর তেইশের বেশী নয়—দলের নেতৃত্ব করছিল। সে বললে মাইকেল আসতে পারলেন না কারণ তিনি অসুস্থ।

দুঃখ প্রকাশ করলাম। আরও জানতে চাইলাম ডেশার্ডের আঘাতটা কেমন আছে।

রুপার্ট হেসে বললে—খুব শীগগিরই আঘাতটার ওষুধ খুঁজে পাবেন তিনি।

এবার আমিও হাসি।

ডেশার্ডের ওষুধ আমি জানি, তা হল প্রতিহিংসা।

বিদায় নিল তিনজন। রুপার্ট যাবার সময় স্যাপ্টের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসি হাসল।

ফ্রিট্‌জ আর আমি খেতে গেলাম শহরের সরাইখানায়। এখন বিপদের বিশেষ আশঙ্কা নেই। এদিকে যথেষ্ট জনসমাগম।

বলি—ফ্রিট্‌জ রাজার দুজন অনুচরের জন্যে একটা ঘর ভাড়া করবেন। একজনের দাঁতে ব্যথা। সরাইখানায় একটা সুন্দরী মেয়ে আছে। ব্যবস্থা করুন সে যাতে পরিবেশন করে।

—কী করে ?

—যে করেই হোক।

আমার মুখ আমি ঢেকে রেখেছি।

এক মিনিট ফ্রিট্জ পরে এসে বলে—মেয়েটি আসছে। সে মদ ঢেলে দেয়।

—ভদ্রলোকের কী খুব কষ্ট হচ্ছে? মেয়েটি জানতে চায়।

বল্লাম—ভদ্রলোকের কিছুই হয় নি।

মুখের ঢাকাটা খুলে ফেলি।

মেয়েটা চেঁচিয়ে ওঠে। বলে—মহারাজ আপনি? আমি ছবি দেখেই মাকে বলেছিলাম। আমায় ক্ষমা করুন।

—আপনি তো কিছুই করেন নি।

—কিন্তু যেসব কথা আমরা বলছিলাম।

—ওসব ক্ষমা করব—যদি রাজার হয়ে কাজ করেন।

—ধন্যবাদ মহারাজ। যাই মাকে বলে আসি।

—দাঁড়ান। আমরা বেড়াতে আসি নি। খাবার আনুন। কাউকে বলবেন না রাজা এখানে।

মেয়েটি খাবার নিয়ে এল তার মুখে কৌতূহল।

বলি—জোহান কেমন আছে?

—তার সঙ্গে বড় দেখা হয় না।

—কেন?

—আমি তাকে ঘনঘন আসতে বারণ করে দিয়েছি।

—তাহলে ডেকে আনতে তো পারেন?

—কিন্তু এখন তো সে দুর্গে আছে। বাড়ি দেখাশুনো করছে।

—জোসেফ তাহলে পরিচারিকা হয়ে গেল?

—ওখানে তো মেয়ে মানুষ নেই সার। ওরা বলে একজন ভদ্রমহিলা ওখানে আছেন।

—কিন্তু তুমি ডাকলে তো জোহান আসবে?

—সেটা নির্ভর করে সময় ও স্থানের ওপর।

—ওকে ভালবাসো না?

—না সার। তবে আপনার কাজ করতে রাজী আছি।

—ঠিক আছে তাহলে ওকে বল জেণ্ডার পরে দ্বিতীয় মাইলস্টোনটার কাছে আসতে।

—ওর তো কোন ক্ষতি হবে না?

—না ও যদি আমাদের কথা মত কাজ করে।

মেয়েটিকে কিছু টাকা দিই।

এবার আমি আসি।

ফ্রিট্জ জানতে চান আমি জোহানকে বন্দী করতে চাই কী না।

—হ্যাঁ। মনে হয় ঠিক ফাঁদটিই পেতেছি।

যেতে না যেতেই স্যাপ্ট দৌড়ে আসেন। আমাদের নিরাপদ দেখে ভারী সুখী।

জিগ্যেস করলেন ওদের দেখেছি কী না।

—ওদের?

—আপনার মোটেই একা বেরোনো উচিত না। আমাদের দেহরক্ষীদের মধ্যে একজন লম্বা চেহারার বার্নেনস্টাইন আছে মনে পড়ে?

বলি—হ্যাঁ।

তার হাতে গুলি লেগেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে সে নাকী বনে বেড়াতে যায়। তিনজন লোককে দেখতে পায় সে। একজন গুলি ছোঁড়ে। তার সঙ্গে অস্ত্র ছিল না। সে পালিয়ে আসে।

স্যাপ্ট বলেন—বুলেটটা ছিল আমারই জন্যে।

বলি—স্যাপ্ট, দেশে ফেরার আগে আপনাদের বন্ধুত্বের উত্তরে একটা কাজ করার ইচ্ছে আছে।

—কী।

—ওই ছটার সবকটাকে খুন করা। দেশটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পরদিন সকালে বাগানে বসে আছি। মনে শান্তি। অনেকদিন পরে স্বস্তি পেয়েছি একটু।

দূরে দেখা দিল রুপার্ট হেণ্টশো—নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে।

আমার সঙ্গে একা কথা বলতে চায়।
সঙ্গীদের দূরে যেতে বলি।
—র‍্যাসেনড্রিল সে বলে,—ডিউক—
উঠে দাঁড়াই।
বলি—আমার লোকদের বলব, আপনার ঘোড়াটা এনে দেবে?
—ভান করে কী লাভ?
—কারণ প্রয়োজনটা ফুরোয় নি।
—ঠিক আছে, মহারাজ। কিন্তু আপনাকে আমার ভাল লাগে। আপনি অনেকটা আমার মত।
—ধন্যবাদ। হয়তো কিছুটা—কেবল আমি সৎ, কথা রাখি, পুরুষদের সঙ্গে, আর সম্মান, মেয়েদের সঙ্গে।
ও রেগে যায়।
বলি—খবরটা কী?
—ডিউক প্রস্তাব করেছেন একটা। নিরাপদে দেশের সীমানায় পৌঁছে দেবেন আর দেবেন এক লক্ষ পাউণ্ড।
—নিচ্ছিনা।
—আমিও মাইকেলকে তাই বলে ছিলাম। আসলে মাইকেল ভদ্রলোকের চরিত্র বোঝে না।
—আর আপনি? আমি হাসি।
—আমি বুঝি আপনি বরং মরে যাবেন তবু—
—সেটা আপনি দেখতে পাবেন না। যাহোক, আপনাদের বন্দী কেমন আছেন?
—রাজা—
—আপনাদের বন্দী।
—ওহো, ভুলে গেছিলাম, মহারাজ। তিনি বেঁচে আছেন।
উঠে দাঁড়াই।
সেও উঠে দাঁড়ায়।
এরপরেই সবচেয়ে দুঃসাহসী ঘটনাটা দেখলাম।
মাত্র তিরিশ গজ দূরে আমার সঙ্গীরা।
রুপার্ট একজন ভৃত্যকে ঘোড়া আনতে বলল তারপর চড়বার মুহূর্তে আমার দিকে ডানহাত বাড়িয়ে দিল। বাঁহাত বেলটের ওপর।
—করমর্দন করুন।
মাথা বেঁকাই এবং হাতদুটো পেছনে রাখি। আমি এ করব তা ও জানত।
অতি দ্রুতগতিতে ওর বাঁহাতটা ছোট একটা ছোরা বের করে আঘাত করে। আরেকটু হলেই আমার বুকে বিঁধে যেত সরে আসায় বেঁচে যাই।
চেয়ারে বসে পড়ি। রক্তপাত হতে থাকে।
রুপার্ট ঘোড়ায় চড়ে পালায়।
অজ্ঞান হয়ে যাই।
জ্ঞান ফিরলে দেখি পাশে ফ্রিট্‌জ। আমার আঘাত গুরুতর নয়।
জোহান নাকি ধরা পড়েছে। সে এখানেই।
সবচেয়ে বড় কথা ধরাপড়ে তার দুঃখ হয় নি। সে আঁচ করেছে তার কার্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই মাইকেল ছয় অনুচর বাদে সবাইকে মেরে ফেলবে।
জোহানকে আনতে বলি।
প্রথমে সে ভয় পায়। তারপর সব বলে। লোকটা দুর্বল, অসৎ নয়। যা করেছে ডিউকের ভয়েই করেছে। ডিউকের অনেক প্ল্যানই সে জানে।
জানা গেল রাজাকে রাখা হয়েছে দুর্গে একটা ছোট ঘরে, পাহারায় থাকে তিনজন। কোন আক্রমণ হলে দুজন রক্ষা করবে রাজাকে একজন করবে প্রতি আক্রমণ। রুপার্ট বা ডেশার্ড সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবে রাজাকে।
কিন্তু রাজার দেহটা? মাইকেল তো চাইবে না দেহটা কেউ দেখে ফেলে!

জোসেফ বলে রাজার ঘরের জানলায় বাঁধা আছে মস্ত একটা পাইপ। পাইপটা গিয়ে পড়েছে ঠিক পরিষ্কার জলে। রাজার মৃতদেহ পাইপের মধ্যে দিয়ে ফেলে দেওয়া হবে জলে। তারপর রক্ষীরাও পাইপ বেয়ে জলে ঝাঁপ দেবে ও পালাবে।

—মনে কর—আমি বলি—যদি কয়েকটা লোক নয়, পুরো একটা সৈন্যদল আক্রমণ করে তাহলে ?

—তাহলে বাধা দেওয়াই হবে না। রাজাকে গোপনে মেরে ফেলা হবে, দেহটা ফেলে দেওয়া হবে জলে, আর ওই ছয় জনের একজন সাজবে নকল বন্দী। মাইকেল বলবে ওই অনুচরের ওপর রেগে গিয়েছে সে।

কী ভীষণ চতুর প্ল্যান।

যেভাবেই আক্রমণ করা যাক, রাজা মরবেই।

রাজা এসব জানেন ?

—হ্যাঁ যখন আমি আর আমার ভাই পাইপটা লাগাচ্ছিলাম তিনি জিগ্যেস করলেন ওটা কী ?

রুপার্ট বললেন—ওটা জ্যাকবের সিঁড়ি, স্বর্গে যাবার জন্যে। সার, সত্যি বলতে কী জেণ্ডার দুর্গে কথায় কথায় খুনোখুনি হয়।

—ঠিক আছে জোহান কেউ যদি জিগ্যেস করে জেণ্ডায় কোন বন্দী আছে কী না, বলো হ্যাঁ। যদি জানতে চায় বন্দী কে, বলো না।

ও চলে গেলে স্যাপ্টের দিকে তাকাই।

—মনে হচ্ছে রাজার বাঁচবার দুটো মাত্র পথ আছে। এক দুর্গের বাসিন্দাদের কারও বিশ্বাসঘাতকতা, দুই ঈশ্বরের করুণা।

নবম পরিচ্ছেদ

রুরিটানিয়ার সাধারণ মানুষ যদি আমাদের কথা শুনতে পেত অবাক হয়ে যেত।

সকলে জানে আমি শুয়োর শিকার করতে গিয়ে আহত হয়েছি। আঘাতের বিবরণ খুব গুরুতর বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য হল মাইকেল ভাববে আমি ভীষণ আহত, আর কর্মে অক্ষম। জোহানের কাছে জানলাম সে তা বিশ্বাসও করেছে।

এতে আরও দুটো ফল হয়েছে। এক—জেণ্ডার ডাক্তারেরা আমার ওপরে চটে গেছেন, কেননা ফ্রিট্‌জের এক বন্ধু ছাড়া আর কাউকে আমরা চিকিৎসা করতে দিই নি। দুই—রাজকুমারী ফ্লেভিয়া কারও নিষেধ না শুনে জেণ্ডায় আসছেন।

ফ্লেভিয়ার আমাকে সুস্থ দেখে সেই আনন্দের দৃশ্য কখনো ভুলবো না। সে দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসছে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী যেন স্বর্গের স্বাদ পেল। এই স্বাদ পেলাম পুরো দুটো দিন।

তারপরে আমরা আক্রমণের পরিকল্পনা করলাম। রাজা নাকী কয়েদ থেকে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

অতএব তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার। আমার দিক থেকে তাড়াতাড়ির আরও একটা কারণ আছে। সেনাপতি ক্রমাগত তাগাদা দিচ্ছেন বিয়ের দিন ফেলবার জন্যে। রাজকুমারীর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা তারপর এই তাগাদা—আমার মনের অবস্থাটা কল্পনা করুন।

স্যাপ্ট পরে আমায় বলেছিলেন ওইসময় ঠিক ডিক্টেটরের মত ব্যবহার করছিলাম। কারও প্রতিবাদ শুনতাম না।

অতএব পরের দিন স্যাপ্ট, ফ্রিট্‌জ, আমি এবং ছয়জন অনুচর ঘোড়ায় চেপে জেণ্ডাদুর্গের দিকে রওনা হলাম। স্যাপ্টের হাতে একটা দড়ি, আমার হাতে লাঠি এবং ছুরি।

রাতটা ছিল অন্ধকার আর ঝোড়ো।
ছজন লোক অন্ধকারে গাঢাকা দিল।
দরকার হলে স্যাপ্ট বাঁশি বাজিয়ে তাদের ডাকবেন।
কাউকেই দেখতে পেলাম না।
পরিখার ধারে এলাম তিনজন।
স্যাপ্ট দড়িটা বাঁধলেন একটা গাছে।
আমি জুতো খুলে লাঠিটা দাঁতে চেপে ধরে ছুরিটা কোমরে গুঁজে জলে ঝাঁপ দিলাম।
সেতুটা খুঁজতে হবে।
দেওয়াল বেয়ে উঠি।
নতুন প্রাসাদের আলো একদিকে। গলাও শোনা যায়। হেনটশো মদ খেয়ে হল্লা করছে।
ছায়ার মত কী একটা চোখে পড়ল। সেই পাইপটা।
কাছাকাছি যেতে দেখি একটা নৌকোর মাথা, কেউ কী পাহারা দিচ্ছে?
জলের তলায় একটা ধাপ পেলাম। তার উপরে দাঁড়িয়ে আত্মগোপন করি।
নৌকায় একটা লোক। পাশে বন্দুক।
লোকটা ঘুমোচ্ছে।
কাছে এগিয়ে যাই।
বিরাটকায় লোক—জোহানের ভাই ম্যাক্স। ছুরিটা টেনে নিই।
এই কাজটার কথা ভাবলেই লজ্জাবোধ হয়।
কিন্তু কী করব।
ঘুমন্ত লোকটার বুকে ছুরি বসিয়ে দিই।
সে চেঁচাবারও সময় পায় না।
এবার তাড়াতাড়ি সেতুটা খুঁজি।
সময় খুব অল্প।
দেয়ালের ওপাশে আলোর রেখা।
ডেশার্ডের গলা।
রাজার সঙ্গে কথা বলছে সে।
—কী মহারাজ, রাত্তিরে আর কিছু দরকার আছে?
রাজা কথা বলেন।
কী ক্ষীণ তাঁর কণ্ঠস্বর।
—আমার ভাইকে বল আমাকে শেষ করে দিতে। এরকম তিলে তিলে মরতে চাই না।
—ডিউক চাননা আপনি মারা যান।
আলোটা নিভে যায়। দরজায় তালার শব্দ হয়।
রাজার সঙ্গে কথা বলা এখন বিপদজনক। তাই নৌকোয় চেপে ম্যাক্সের দেহটা সরিয়ে ফেলি।
কে ডাকে—ম্যাক্স!
তাড়াতাড়ি ডাকি—স্যাপ্ট!
দড়িটা কোমরে বেঁধে নিয়েছি আর আমি উঠে এসে ম্যাক্সকে টেনে তুলি।
স্যাপ্টের হুইস্‌ল্‌ শুনে দলের লোকেরা এসে হাজির হয়।
আবার দুর্গ থেকে তিনজন লোককেও দেখতে পাই।
—ভীষণ অন্ধকার।—রুপার্টের গলা।
তারপরেই গুলি চলে।
মাঝে মাঝে আর্তনাদ।
হঠাৎ একটা ঘোড়া আমার দিকে ছুটে আসে। তার ওপর রুপার্ট।
চেঁচিয়ে উঠি।
এবার সে আমাদের কব্জায়।
হাতে একটা তলওয়ার মাত্র।
—ও অভিনেতা তুমি।
ও তলওয়ার দিয়ে আমার লাঠিটা টুকরো করে দেয়।
লাফিয়ে সরে যাই।
ও ঝাঁপ দেয় পরিখায়।

অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পারে সে।

—কী হল। আমি জানতে চাই।

একজন বলে—ল্যাভেনগ্রাম আর ক্র্যাফটস্টাইন দুজনেই মারা গেছে।

—আর ম্যাক্স ও,

দেহগুলো জলে ফেলে দিই।

আমাদেরও তিনজন মারা গেছে।

* * *

এই মৃত্যুগুলো চেপে রাখা গেল না।

আমি মাইকেলের কাছে ক্ষমা চাই, সে আমার কাছে।

আমরা কেউই সত্যিকথা বলতে পারছি না।

এদিকে রাজাকেও উদ্ধার করা যাচ্ছে না।

মাইকেলের সঙ্গে প্রকাশ্য বন্ধুত্বের ফলে দিনের বেলায় নিরাপদে দুদলে দেখা করা সম্ভব হচ্ছে।

একদিন স্ট্রেলসোর পুলিসপ্রধান আমার কাছে এসে বলে বাসস্থান সম্পর্কে আপনার হুকুম কার্যকরী করা হচ্ছে।

—সেইজন্য এখানে এসেছেন।

—না মহারাজ ইংরেজ রাজদূতের অনুরোধে এসেছি।

—কেন? লোকটা আমায় ভাবনায় ফেলে দেয়।

—তাঁর দেশের একজন ভদ্রলোককে পাওয়া যাচ্ছে না। দু'মাস ধরে তাঁর কোন খবর নেই।

ফ্লেভিয়া খবরটায় কান দিচ্ছে না।

স্যাপ্টের দিকে তাকাতে সাহস হল না।

—তাঁর নাম—

—র‍্যাসেনডিল, মহারাজ। শোনা যায় তিনি আঁত্যোয়নেত দ্য মোবানের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছেন।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান?

—তিনি হয়তো ভদ্রমহিলার প্রেমে পড়েছিলেন। লোকটি দুর্গের দিকে তাকায়।

বলি—হ্যাঁ মহিলা ওখানেই আছেন। তবে সেই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ওখানে নেই।

—ডিউক প্রতিদ্বন্দ্বী পছন্দ করেন না।

—খুব গুরুতর অভিযোগ করছেন। আপনি বরং স্ট্রেলসোয় ফিরে যখন।

—রাজদূত বড্ড চাপাচাপি করছেন, মহারাজ।

—তাঁকে বুঝিয়ে বলুন। ইতিমধ্যে, আমি নিজে খোঁজখবর করব।

এসব খবরাখবর বন্ধ করতেই হবে।

দশম পরিচ্ছেদ

রাত্রি বেশ সুন্দর পরিষ্কার।

খারাপ আবহাওয়াই আমার পছন্দ ছিল।

মধ্যরাতে স্যাপ্টের দল জঙ্গলের পথ দিয়ে জেণ্ডার দুর্গে গেল। দুটো বাজার পরে ওরা দুর্গের সামনের দরজায় হাজির হবে। দরজা না খুললে ফ্রিট্‌জ পিছন দিকে গিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দেবে।

আমার সঙ্গে দেখা না হলে টার্লেনহাইমে ফিরে গিয়ে সৈন্যদল নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করবে।

আমায় না দেখতে পেলে ধরে নিতে হবে আমি মরে গেছি।

এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজাও খুন হয়েছেন।

আমি চললাম একা।

হাতে একটা দড়ি ও ছোট সিল্কের মই—যা দিয়ে পরিখার ওপারে যাব। আমি যাচ্ছি শর্টকাট পথে।

সাড়ে বারোটায় পরিখায় নামব আমি।

দড়িটা গাছের সঙ্গে বাঁধি। জলে নামি সাঁতরাতে সাঁতরাতে শুনতে পাই একটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। একটু পরেই সেতুটায় পৌঁছই। পরিখার ওপারে ডিউক আর আঁত্যোয়নেতের জানলা।

হঠাৎ ডিউকের জানলায় আলো জ্বলে ওঠে। আঁত্যোয়নেত বাইরে তাকায়।

দশম পরিচ্ছেদ

টার্লেনহাইমের দিকে ফিরে যাচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলাম জেণ্ডার দুর্গ থেকে শোকযাত্রা চলেছে।

সামনে ইউনিফর্ম পরে দুটি ভৃত্য, তারপর একটি কফিন, তারপরে কালো পোশাকে একজন।

লোকটা রুপার্ট।

আমাদের দেখে রুপার্ট এগিয়ে আসে।

জিগ্যেস করি, গেছে কে মারা ?

—আমার বন্ধু ল্যাভেনগ্রাম।

স্যাপ্টের হাত পকেটের মধ্যে রিভলবারটা মুঠো করে ধরে।

ফ্লেভিয়া জানতে চায়—উনি কী যুদ্ধে মারা গেছেন ?

—আপনার কোমল হৃদয়। বন্ধুর জন্যে হৃদয় আমার ভারী। মহারাজ, ওঁর মত শীগগিরই আরও অনেককে কবরে যেতে হবে।

বলি—ঠিক, আমাদের সবারই তা মনে রাখা উচিত।

রুপার্ট বলে—এখন কী রাজাদেরও, মহারাজ। বলে চলে যায়।

কী ভেবে ওর পিছু নিই।

বলি—সেদিন খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। যদি আপনাদের বন্দীকে জীবিত ফেরত দেন, তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, কথা দিচ্ছি।

সে হাসে।

—দেখুন, আপনি তো মাইকেলের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। দুর্গ আক্রমণ করুন বীরের মত, স্যাপ্ট আর টার্লেনহাইমকে যুদ্ধ চালাতে দিন।

—বলুন।

—সময়টা ঠিক করুন আমার সঙ্গে।

—আপনার ওপরে আমার অগাধ বিশ্বাস।

—শুনুন, কাজের কথা বলছি। স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জ মারা যাবেন। মাইকেল মারা যাবেন—

—সেকী।

—মাইকেল কুত্তাটা মারা যাবে। বন্দী পাইপ বেয়ে নীচে যাবে—ব্যাপারটা জানেন দেখছি—বাকী থাকব শুধু আমি, আর আপনি, রুরিটানিয়ার রাজা।

ওর গলা কাঁপতে থাকে।

—প্ল্যানটা ভালো নয় ? আপনি পাবেন রাজত্ব রাজকন্যা, আমি উঁচু পদ আর আপনার বিশ্বাস।

—শয়তানীতে আপনার তুলনা নেই।

—ভেবে দেখুন ভাল করে।

—আমার সামনে থেকে সরে যান। আমি বলি। আবার বলি—

—আপনার প্রভুর বিপক্ষে যাবেন ?

ও মাইকেলকে গালিগালি দেয়। মাইকেল ওর পথের কাঁটা। ঈর্ষাপরায়ণ। কালে রাতেই নাকী তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছিল ও।

হাল্কা করে বলি—কারণ ? কোন মেয়ে ?

—হ্যাঁ। সুন্দর একটি মেয়ে। তাকে আপনি দেখেছেন।

—ও সেই টেবিল যুদ্ধের সময়ে ?

—ডেশার্ড একটা বুদ্ধু। আমি থাকলে ওটা হত না।

—ডিউক বাধা দিচ্ছেন ?

রুপার্ট হাসে—আমি বাধা দিচ্ছি। মাইকেলের এটা পছন্দ নয়। বোকা মেয়েটাও মাইকেলকে বেশী পছন্দ করে। যাকগে ভেবে দেখবেন।

লোকটা চলে যায়।

লোকটার শয়তানী বুদ্ধিতে অবাক হয়ে যাই।

টার্লেনহাইমে যেতেই একটা চিঠি পেলাম।
লেখা আছে—
একবার আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। দয়া করে আমাকে এই বাড়ি থেকে উদ্ধার করুন। 'এ'
স্যাপ্ট দেখে বলেন—ও ওখানে গেছে কেন?
মেয়েটার জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু কী করব?
অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে!
একটা পুলিসের সন্দেহ আমার অন্তর্ধানের ব্যাপারে। দুই স্ট্রেলসের লোকেরা ভাবছে আমি কেন এতদিন শহর ছেড়ে আছি।
সেনাপতি চ্যান্সেলারকে নিয়ে বিয়ের এনগেজমেণ্টের দিন ঠিক করতে এলেন।
ফ্লেভিয়া কাছেই ছিল। তাই দুসপ্তাহ পরে একটা দিন ঠিক করতেই হল।
সারা দেশের লোক খুশী—কেবল আমি আর মাইকেল বাদে। আর এক হতভাগ্য জানল না—সে দেশের রাজা।
এদিকে খবর পেলাম রাজা খুব অসুস্থ। নড়তে চড়তে পারছেন না। ডাক্তার তাঁর অবস্থা দেখে শংকিত, কিন্তু ডিউক তাঁকে একভাবেই রেখেছে, আঁতোয়ানেত তাঁর সেবা করছে।
অর্থাৎ রাজা মুমূর্ষু।
—এখন পাহারার কী ব্যবস্থা।
—ডেশার্ড আর বারসেনিন থাকে রাতে, রুপার্ট আর দ্য গোতে দিনে।
জোহানকে দুর্গে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। তার মুখে আঁতোয়নেতকে আশ্বাস পাঠাই।
জোহানের কাছ থেকে খুঁটিনাটি খবর পাই।
মাইকেল নাকি আঁতোয়ানেতের দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ রাখে।
জোহানকে নির্দেশ দিই পরদিন রাত্রে ঠিক দুটোর সময়ে সদর দরজাটা খুলে রাখার।
সে পালাতে পারে তারপর।
আঁতোয়ানেতের কাছে একটা চিঠিও দিই তার হাতে।
লোকটা ভীষণ ভয় পেয়েছে।
স্যাপ্ট আর ফ্রিট্‌জকেও পরিকল্পনাটা জানাই। স্যাপ্ট বলেন তাঁরাই শুধু যাবেন। তাহলে মাইকেল রাজাকে মেরে ফেললেও আমি সিংহাসনে থাকতে পারব।
আমি রাজী নই। অপরের স্বার্থে রাজা সাজতে রাজী হয়েছি, কিন্তু নিজের স্বার্থে রাজ্য দখল করতে পারব না।
বিয়ের এনগেজমেণ্টের সময়ে আমি সত্যি কথা বলে দেব।
অতএব স্যাপ্ট রাজী হলেন।
আমার প্ল্যানটা এইরকম:
স্যাপ্টের নেতৃত্বে একটা দল যাবে নতুন দুর্গের দরজায়। জোহান দরজা খুলতেই ঢুকে পড়বে। আঁতোয়ানেত চেঁচিয়ে উঠবে—নির্দেশ দেওয়া আছে তাকে। সে বলবে হেল্প, হেল্প। রুপার্ট তাকে আক্রমণ করেছে। মাইকেল নিশ্চয়ই ছুটে বেরোবে—আর স্যাপ্টের হাতে ধরা পড়বে। আরও চেঁচা-মেচি মাইকেলের চাবি কেড়ে নেওয়া হবে সেতু বেয়ে এদিকে আসবে। রুপার্টও নিজের নাম শুনে সেতু বেয়ে আসবে। দ্য গোতে পাহারায় থাকতেও পারবে।
রুপার্ট যখন সেতুর ওপরে উঠবে? আমি সাঁতরে ওখানে লুকিয়ে থাকব। রুপার্ট—এবং দ্য গোতে আমার হাতে খুন হবে।
আমরা চাবি পেয়ে যাব।

ডেশার্ড কী বারসোনিন এদেরও অতি সহজে কাবু করা যাবে।

মরীয়া হয়ে এই প্ল্যান করেছিলাম।

সেনাপতিকে জানিয়ে রেখেছি যদি সকালে আমরা না ফিরি তিনি যেন জেণ্ডার দুর্গ দখল করেন। রাজাকে দেখতে চান, এবং না পেলে ফ্লেভিয়াকে রাণী বলে যোষণা করেন আর জানিয়ে দেন মাইকেল রাজাকে হত্যা করেছে।

হয়তো তাই হবে।

হয়তো মাইকেল বা আমি বা রাজা কেউই আর বাঁচবো না।

বিদায় নেবার সময়ে ফ্লেভিয়াকে একটা আংটি দিলাম। আমাদের পারিবারিক আংটি।

—যখন রাণী হবে তখন অন্য আংটি পরলেও এটা পরে থেকো।

—যাই পরি না কেন এটা চির দিন পরব।

ফ্লেভিয়া আংটিটি চুম্বন করল।

জল তার চোখে এবং আমার চোখেও।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রিটা বেশ সুন্দর পরিষ্কার।

অবশ্য খারাপ আবহাওয়াই আমার পছন্দ ছিল।

মধ্যরাতে স্যাপ্টের দল জঙ্গলের পথ দিয়ে জেণ্ডার দুর্গে গেল। দুটো বাজার পরে ওরা দুর্গের সামনের দরজায় হাজির হবে। দরজা না খুললে ফ্রিটজ পিছন দিকে গিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দেবে। আমার সঙ্গে দেখা না হলে টার্লেনহাইমে ফিরে গিয়ে সৈন্যদল নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করবে।

আমায় দেখতে না পেলে ধরে নিতে হবে আমি মরে গেছি।

এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজাও খুন হয়েছেন।

আমি চললাম একা।

হাতে একটা দড়ি ও সিল্কের মই—যা দিয়ে পরিখার ওপরে যাব। আমি যাচ্ছি শটকাট পথে। সাড়ে বারোটায় পরিখায় নামব আমি।

দড়িটা গাছের সঙ্গে বাঁধি। জলে নামি। সাঁতরাতে সাঁতরাতে শুনতে পাই একটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। একটু পরে সেতুটায় পৌঁছই। পরিখার ওপারে ডিউক আর আঁতোনায়েতের জানলা।

হঠাৎ ডিউকের জানলায় আলো জ্বলে ওঠে। আঁতোয়ানেত বাইরে তাকায়।

একটু পরে একজন লোক এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। সে চমকে সরে যায়।

লোকটি রুপার্ট।

সে কানে কানে কী বলতে চায়।

রুপার্ট বলছে চুলোয় যাক মাইকেল। তার রাজকুমারী আছে। মাইকেলের মধ্যে তুমি কী দেখেছ।

—তোমার কথা ওকে বলে দেব। আঁতোয়ানেত বলে।

—বল গে। হঠাৎ সে মহিলাকে চুমু খায়।

বলে—বলে দিও।

মেয়েটি হতাশ হয়ে মাথার ওপর দুইহাত তোলে।

রুপার্ট বলে—জান মাইকেল কী বলেছে?

নকল রাজাকে যদি মারতে পারি—ও নেবে ফ্লেভিয়াকে, আমি তোমাকে।

পেছনে একট দরজা খুলে যায়।

মাইকেলের গলা—তুমি ওখানে কী করছ?

সে জানলার ধারে এসে রুপার্টকে চেপে ধরে।

ভয় দেখায়—পরিখার জলে রাজা ছাড়া আরও কেউ কেউ যাবে।

—ভয় দেখাচ্ছেন।

—সাবধান করছি।

—র‍্যাসেনডিলকেও অনেকবার করেছেন। সে আজও বেঁচে আছে।

—আমার অনুচরদের দোষ।

দুজনে ঝগড়া শুরু করে।

মাইকেল প্রথমে স্থির হয়।

—বারসোনিন আর ডেশার্ড পাহারায় আছে?

—আছে।

তোমাকে আমার আর দরকার নেই।

দশ মিনিটের মধ্যে সেতুটা তুলে নেওয়া হবে।

মাইকেল জানায়।

রুপার্ট চলে যাচ্ছে।

আর কাউকে দেখতে চাই না।

তারপর দেখি রুপার্ট আর দ্য গোতে সেতু পার হয়ে চলে যাচ্ছে। সেতুটা তুলে নেওয়া হল। একটা বেজে পনেরো মিনিট।

হঠাৎ খুট করে আওয়াজ হয়।

দেখি পুরনো দুর্গের দরজায় রুপার্ট। দেয়ালের খাঁজ বেয়ে উপরে উঠে যায়—দাঁতে ধরে আছে উন্মুক্ত তরোয়াল।

ইচ্ছে করছিল ওকে আক্রমণ করি কিন্তু আমার প্ল্যান রাজাকে বাঁচানো।

পরিখা পার হয়ে সে নতুন দুর্গের দরজায় পৌঁছয়। দরজা খোলা ভেতরে যায়।

আমার প্ল্যান ছাড়া আরও একটা প্ল্যান আজরাতে এখানে কাজ করছে।

যাই করুক রুপার্ট, পুরনো দুর্গে সে নেই। সেখানে মাত্র তিনজন লোক

আহা শুধু যদি চাবি আমার কাছে থাকত।

মাইকেলের ঘর অন্ধকার। ঘুমোচ্ছে সে।

তারপর একটা দরজা খোলার আওয়াজ হল।

যেন একটা আলো ডেঙে পড়েছে। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল।

চিৎকার উঠল—বাঁচাও মাইকেল।

পাথরের খাঁজ বেয়ে পাগলের মত উঠি—পুরনো দুর্গের দরজায় দাঁড়াই। আর কী করব।

তারপর মাইকেলের গলা—দরজা খোল। আঁতোয়ানেতের দরজা প্রাণপণে ধাক্কাচ্ছে সে।

মেয়েটি চেঁচায়—বাঁচাও মাইকেল। রুপার্ট হেনস্টো।

মাথার ওপরে জানলাটা খুলে যায়।

দ্য গোতে হাঁকে—কী হয়েছে?

আঁতোয়ানেতের জানলাও খোলে।

একজন আহতের চিৎকার।

রুপার্ট কার সঙ্গে যুঝছে।

—জোহান এবার তোমার পালা।

তারপর বলে।

—এবার তুমি মাইকেল।

তাহলে জোহান ওখানে।

কী করে দরজা খুলবে সে?

রুপার্টকে ঘিরে ধরেছে পাঁচ—ছটা লোক। এক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে রইল খোলা জানলায়, তারপরে ঝাঁপ দিল জলে।

আমার সামনের দরজায় এসে দাঁড়াল দ্য গোতে। তাকে প্রচণ্ড আঘাত করি। লোকটা মরে গেল।

ওর দেহ থেকে চাবির গোছা খুঁজে নিই।

একটা লাগাতেই রাজার ঘরটা খুলে গেল। লণ্ঠনটা জ্বালি।

কে একজন বসে—কী হয়েছে? আরেকজন বলে—ওকে কী মেরে ফেলব। কিছুক্ষণ নীরবতা।

ডেশার্ড বলে—একটু দাঁড়াও। তাড়াহুড়ো করো না। আলোটা নিভিয়ে দিই।

—অন্ধকার হয়ে গেল। আলোটা নিভে গেল—বারসনিন চেঁচায়।

চূড়ান্ত মুহূর্ত এসেছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় ধাক্কা দিই।

দরজা খুলে যায়।

বারসনিন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তলোয়ার।

ডেশার্ড বসে আছে।

আমায় দেখে অবাক হয় দুজনে।

প্রথমে বেলজিয়ান লোকটিকে আক্রমণ করি। যোদ্ধা হিসেবে সে বিশেষ কিছু নয়।

সহজেই ভূপাতিত হয়।

ডেশার্ডকে দেখতে পাচ্ছি না।

সে যুদ্ধ করবে না।

ভেতরের ঘরে গিয়ে সে দোর দিয়েছে।

রাজাকে খুন করতে গেছে।

খুন হয়তো করেও ফেলতে।

যদি না একজন তাঁর জন্যে নিজের প্রাণ না দিত।

ঘরে ঢুকে দেখি রাজা এক কোনায় আছেন। দুর্বল, তাছাড়া, তার হাতদুটো বাঁধা।

ডেশার্ড আর ডাক্তার মারামারি করছে।

কিন্তু কতক্ষণই বা।

ডাক্তারের বুকে তরবারি বসিয়ে দিল ডেশার্ড। তারপরে আমার দিকে ঘুরে বললে—এইবার! ভাগ্যিস তার কাছে রিভলবার ছিল না।

নিঃশব্দে লড়ি আমরা।

সে আমাকে দেয়ালের কাছে কোণঠাসা করে ফেলে।

বাঁহাতে চোট লেগেছে আমার।

খুব ভালো যোদ্ধা সে।

হয়ত আমায় মেরেই ফেলত।

হঠাৎ রাজা—এখন প্রায় পাগল—চেঁচাতে শুরু করেন—ভাই রুডল্‌ফ, আমি তোমায় সাহায্য করব ভাই।

একটা চেয়ার তুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন।

আমি বলি—ওটা দিয়ে ওর গায়ে মারুন। ডেশার্ড পেছনে হটে যায়—রাজাকে আক্রমণ করে।

রাজার আঘাতও লাগে।

তারপর মৃত ডাক্তারের রক্তে পা পিছলে পড়ে যায় ডেশার্ড।

তলওয়ার চালিয়ে দিই তার গলায়।

রাজা কী মারা গেছেন?

দৌড়ে তাঁর কাছে যাই, বুকের স্পন্দন শুনতে চেষ্টা করি।

এমন সময় বাইরে শব্দ হয়।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে আত্মগোপন করি। ওদের রিভলবার দুটো সেখানে ছিল।

একটা নিই।

কেউ একজন সেতুটা লাগাচ্ছে।

কে?

স্যাপ্ট নাকী?

অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনি।

তরুণ রুপার্টের শয়তানী মেশানো হাসি।

এত বিশ্রী হাসি মানুষে হাসতে পারে?

না, আমার লোকেরা আসে নি। তাহলে তারা রুপার্টকে গুলি করত।

তারা নির্দেশমতো যথাস্থানে গিয়ে আমাকে পায় নি।

এতক্ষণে তারা টার্লেনহাইকে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই রাজার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হতাশ হয়ে দরজার গায়ে হেলান দিই।

রুপার্ট চেঁচাচ্ছে।

—সেতুটা লাগান হয়েছে। চলে এস। মাইকেল-কে দেখে নিই। মাইকেল, লড়বে এস।

এরকম একটা কিছু হলে কিছু করতেও পারি।

এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল।

সেতুর এক প্রান্তে ডিউকের অনুচরেরা। কেউ কেউ আলো হাতে করে এনেছে। কারও হাতে অস্ত্র। তারা ভীষণ ভয় পেয়েছে।

রুপার্ট সেতুটার মাঝখানে। হাতে তলোয়ার। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জোহান। মুখে একটা রুমাল চাপা দেওয়া। সেখানেই তার আঘাত লেগেছে। ভাগ্যক্রমে এই অবস্থায় আমার শক্তিই সবচেয়ে বেশী।

রুপার্টকেও যেমন কেউ আক্রমণ করেছে না, আমাকেও করবে না!

রুপার্টকে গুলি করে মেরে ফেলব।

সে জানেও না আমি এখানে আছি।

কিন্তু কিছুই করলাম না।

কেন, কে জানে।

কিছুটা হয়তো বা কৌতূহলও।

দেখিনা কি হয়।

রুপার্ট চেঁচাচ্ছে—মাইকেল, কুত্তা বেরিয়ে আয়।

নারীকণ্ঠে আর্তনাদ ওঠে—হায় ভগবান, সে মরে গেছে।

—মরে গেছে। রুপার্ট হেসে ওঠে।

এই হতভাগারা, অস্ত্র ফেলে দে। তোদের মালিক এখন আমি!

হয়তো ওরা তার কথাই শুনতো।

কিন্তু আরও ঘটনা ঘটল।

দূর থেকে কলরব ভেসে আসে।

এরা আমার লোক।

এদিকে চাকরদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সেতুর ওপর এসে দাঁড়িয়েছে আঁতোয়ানেত।

সাদা রাত্রিবাস তার পরনে, খোলা চুল, মুখ ভয়ে সাদা।

কম্পমান হাতে একটা রিভলবার।

সে রুপার্টকে গুলি করল।

গুলি লাগল না।

রুপার্ট হেসে ওঠে—হায় ম্যাডাম, তোমার চাউনি হাতের তাকের চেয়ে বেশী বিপদজনক। নইলে

এই অবস্থায় পড়তাম না আমি।
আঁতোয়ানেত আবার তাকে তাক করে।
রুপার্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলি খাবে না নিশ্চয়ই।
তার দিকে আমার অস্ত্রটা তাক করি।
কিন্তু সে চেঁচায়—যাকে চুমু খেয়েছি তাকে গুলি করতে পারব না!
বলেই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।
এমন সময় পরিচিত গলা কানে আসে—স্যাপ্টের গলা—ডিউক, ডিউক মারা গেছেন।
বুঝলাম আর আমাকে প্রয়োজন নেই।
রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেতুতে লাফিয়ে উঠি।
চাকররা অবাক হয়ে বলে—রাজা এসেছেন।
রুপার্টের মত আমিও লাফ দিই জলে।
গজ পনেরো আগে আগে চলেছে সে।
হেঁকে বলি—থাম রুপার্ট।
সে থামে না।
এই জল থেকে উঠবার একমাত্র পথ আমার গাছে বাঁধা দড়িটা। রুপার্ট সেটা পেতে পারে, নাও পেতে পারে।
হ্যাঁ সে পেয়েছে!
বলে ওঠে—আরে এটা কী করে এল?
এবার দড়িটা বেয়ে সে ওপরে ওঠে।
এতক্ষণে আমায় দেখতে পায়।—একী ওঃ অভিনেতা। এখানে এলে কী করে?
দড়িটা ধরলাম। তীরে দাঁড়িয়ে সে, হাতে তলওয়ার এক্ষুনি কেটে দেবে দড়িটা।
সে আমার দিকে চেয়ে হাসে।
বলে—মেয়ে মানুষের জ্বালায়—
হঠাৎ সেইসময়ই দুর্গের বড় ঘণ্টাটা বাজতে শুরু করে আর বিপুল কলরব পৌঁছয় কানে।
—তোমার সঙ্গে লড়বার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময়টা একটু গরম। রুপার্ট চলে যায়।
দড়ি বেয়ে উপরে উঠে।
তিরিশ গজ দূরে সে। বনের আশ্রয়ে পালাচ্ছে।
এই প্রথম একটা বুদ্ধির কাজ করল রুপার্ট। পেছনে পেছনে ছুটি আর ওকে ডাকি।

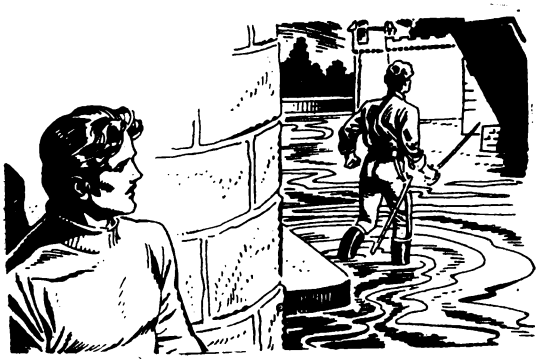

বনের মধ্যে ঢুকে পড়ি আমিও।
এখন হবে তিনটে।
দিন হয়ে গেছে—
সবুজ ঘাসের রাস্তা বেয়ে ছুটে চলেছে রুপার্ট। আমার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মুখ ভেংচাচ্ছে।
ধীরে ধীরে সে হারিয়ে গেল।
ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ি মাটিতে।
এমনই সময় কানে আসে একটা মেয়ের আর্তনাদ আবার দৌড়াতে থাকি।
রুপার্ট একটি মেয়েকে ঘোড়ার পিঠ থেকে তুলে নিচ্ছে। চাষার মেয়ে সে হয়তো বাজারে যাচ্ছিল।
রুপার্ট তাকে একটা চুম্বন আর কিছু টাকা দিল।
কিন্তু চলে গেল সে।
আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।
কাছাকাছি আসতে সে জানতে চাইল—
—দুর্গে কী করছিলে?
—তোমার তিনজন বন্ধুকে খুন করেছি।
—সে কী? রাজার ঘরে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। আশা করি তিনি বেঁচে আছেন।

—বোকারাম। ও সস্নেহে বলে।

আরো একটা কাজ করেছি। তোমার প্রাণরক্ষা করেছি, রিভলবার চালাই নি।

—তাহলে আমি দুটো বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, কী বল।

—ঘোড়া থেকে নাম। যুদ্ধ কর।

—সে কী? মহিলার সামনে?

ও ক্ষেপায়!

রাগে, কী করছি না ভেবেই, ওকে আক্রমণ করি। ওর মুখে লাগে।

ও সত্যি অবাক হয়েছে।

কিন্তু পেছনে আরেকজন আশ্বারোহীকে দেখা যায়। রুপার্ট পালায়।

তার খেলা শেষ!

—বিদায়, র‍্যাসেনডিল।

সে বলে।

রক্তে ভেসে যাওয়া আহত মুখ নিয়ে সে পালায়।

ফ্রিট্‌জ গুলি চালায়।

ওর তলওয়ারটা মাটিতে পড়ে যায়।

হাসতে হাসতে হাত নাড়ে রুপার্ট, তার পরে চলে যায়। সুন্দর অপরাজিত শয়তান।

ফ্রিট্‌জকে চেঁচিয়ে বলি ওকে ধরতে।

কিন্তু ফ্রিট্‌জ ঘোড়া থামিয়ে আমার কাছে আসে।

আমার সেই ক্ষতটা থেকে রক্ত ঝরছে।

ফ্রিট্‌জ আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

—ফ্রিট্‌জ। আমি বলি।

—হ্যাঁ, বন্ধু। সে সাড়া দেয়। স্নেহে কোমল তার কণ্ঠ।

রুমাল বার করে আমার মুখ মুছিয়ে দেয়। বলে —সবচেয়ে বীর পুরুষকে ধন্যবাদ। রাজা বেঁচে আছেন।

মেয়েটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পাশে।

সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি।

* * *

পরে জানতে পারি সেদিন জেণ্ডার দুর্গে কী হয়েছিল। আঁতোয়ানেত বলে তাকে নিয়ে মাইকেল আর রুপার্টের মধ্যে ঝগড়া হত। সেদিনের ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, ওরা দুজনে লড়াই করে, রুপার্ট জানালা দিয়ে পালায়। কিন্তু মাইকেল মরে গেছে সে বোঝেনি। স্যাপ্ট আর ফ্রিটজ সময়মত হাজির হয়, আমার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করে। আমি আসি না। স্যাপ্ট টার্লেনহাইমে ফিরে যেতে চায়। ফ্রিট্‌জ কিন্তু তা শোনে না।

কিছুলোককে টার্লেনহাইমে পাঠিয়ে তারা নতুন দুর্গের দরজা ভেঙে ফেলে।

প্রথম ঘরেই দেখতে পায় ডিউকের মৃতদেহ।

তারপরে আঁতোয়ানেত তাদের বিশেষ কিছুই বলতে পারে নি। বারসোনিনের মৃত দেহ খুঁজে পায় তারা।

তারপরে অবশেষে ডেশার্ড ও ডাক্তারের দেহ এবং অর্ধমৃত রাজাকে।

স্যাপ্ট বুঝলেন রাজা খুব দুর্বল হলেও মরবেন না।

তখন ফ্রিট্‌জ আমায় খুঁজতে বের হল। ফ্রিট্‌জ আমার হাঁকাহাকি শুনতে পায়।

এখন কেবল একটি কাজই বাকী।

গুপ্তকথাটি গুপ্তই রাখতে হবে।

আঁতোয়ানেত আর জোহান কিছু বলবে না বলে কথা দিল।

বলা হবে ফ্রিট্‌জ রাজার বন্ধুকে জেণ্ডার দুর্গ থেকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন! রাজা খুব

(শেষাংশ ৮৩ পাতায়)

ঘোড়া কিনলেন কলিন্স সাহেব

ইন্দ্রজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

এহেন চতুষ্পদ জন্তুটির প্রতি কলিন্সসাহেবের বরাবরই আকর্ষণ। তাই ডাক্তার যখন তাঁর আপাদ মস্তক পরীক্ষা করে আকর্ষণের প্রতি অতিমাত্রায় ভোল্ট চড়িয়ে সায় দিয়ে জানায়, 'শরীরে চর্বি কমাতে হলে একটু রাইডিং প্রাক্‌টিস করা উচিত। তাহলে আর মোটার দিকে শরীরটা ঢলে পড়বে না। দিনকে দিন শরীরটা একটা কুঁজো হয়ে যাচ্ছে।' ডাক্তারের উপদেশ সাহেবকে ভাবনায় ফেলে। নিজের শরীরটার দিকে চোখ নামিয়ে ঝটিতি দৃষ্টি বুলিয়ে ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনি, এককালে ঘোড়া চড়তাম। তবে নিজের দেশে। এখন বয়স হয়েছে। এত ভারি শরীরটা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ি কি করে।

ডাক্তার মাথা নিচু করে জানায়, 'চেষ্টা করে দেখুন।' সাহেবও বিকল্প উপায় জানিয়ে বলে, 'এককাজ করলে হয় না। ঘোড়ার প্রিভিয়াস এডিশন গাধা। ঘোড়ার তুলনায় গাধার পিঠ অনেক নিচু। সহজেই ওঠা যাবে। তাই বলছিলাম—'

ডাক্তার বিরক্ত বোধ করে কোন কথার জবাব দেয় না। রাশভারি চৌকো মুখখানি গম্ভীর ভাবে সাহেবের দিকে তুলে ধরে।

পাশেই জনার্দনবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক্তারের মতিগতি বুঝতে পেরে সাহেবের কানের কাছে নিজের মুখখানি এগিয়ে নিয়ে বলে, 'থাক সার। আর বিশেষ কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ঘোড়া যদি না হয় গাধাই জোগাড় করবো।'

'চোপরাও!' কলিন্স সাহেব বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ে। 'ঘোড়া হোক, গাধা হোক আমি বুঝবো। তোমায় কে মাথা ঘামাতে বলেছে।'

সাহেবের এমন গর্জনে হঠাৎ বোমা ফাটার মতো সকলে চমকে ওঠে। ডাক্তারের পায়ের নিচে নাদুস নুদুস বেড়ালটা ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে অন্দর মহলে ছুটে পালায়।

জনার্দনবাবু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ফাঁসির আসামী। ডাক্তার চোখ থেকে চশমা নামিয়ে দুজনকে বিস্ময়ে দেখতে থাকে। পরক্ষণে জনার্দন বাবুকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কুস্তি লড়তে পারবেন'?

'কুস্তি!' জনার্দনবাবুর শরীরটা যেন কুঁকড়ে যায়। গলার স্বর নামিয়ে ডাক্তারকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে হঠাৎ কুস্তি লড়ার কথা কেন বলছেন বলুন তো?'

কলিন্সসাহেবের মোটা থেকে রোগা হওয়ার সহজ পথ

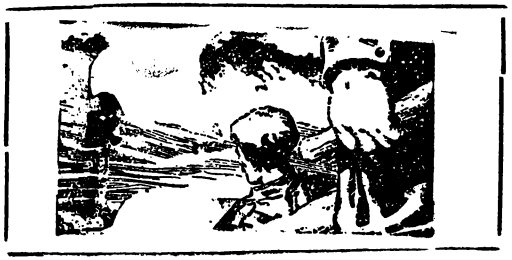

বাতলিয়ে ডাক্তার বলে, 'ঘোড়ায় যদি উনি না চড়তে পারেন, কুস্তি করলেও অনেকটা কাজ হবে। তাই বলছিলাম সাহেবের সঙ্গে রোজসকালে যদি কিছুক্ষণ কুস্তি লড়ার চর্চ্চা করেন—'

ডাক্তারের উপদেশ সাহেবের মনে ধরে। কিং কঙের মতো লাফিয়ে ওঠে কলিন্স সাহেব বলে: 'তাই হবে ডাক্তার। এমন একটা খাঁটি ওষুধ এতক্ষণ মগজে কারুর আসেনি।'

'সার—' জনার্দনবাবু হুমড়ি খেয়ে সাহেবের গায়ে পড়ে বলে, 'ওর মধ্যে আমাকে রাখবেন না। শেষ বয়সে এই শরীরে হাড় কখানা ছাড়া আর কিছুই নেই। আর যাই বলুন, কুস্তি আমি কিছুতেই লড়বো না।'

'জনার্দন, আজকাল তুমি বড় অবাধ্য হয়েছো।' সাহেব গম্ভীর হয়ে বলে, 'কুস্তির মারপ্যাঁচে আমাদের দু'জনকারই ভাল হবে। আমার চর্বি গলবে আর তোমার হাড় গিলগিলে শরীরটাতে কিছু মাংসও গজাবে।'

'গজাক।' জনার্দনবাবু কোনরকম যুক্তি মানতে নারাজ। বলে: 'আমার একটু হাফাঁনি রোগ আছে সার। হার্টফেল হয়ে যেতে পারে।'

'বাহ্, এমন একটা সুন্দর অসুখ তোমার মধ্যে আছে আগে কখনো বলনি তো। ঐ অসুখটা আমার ভীষণ ভাল লাগে। মেডিকেল সায়েন্সে কি বলে জান?' জনার্দনবাবু আগ্রহসহকারে ঘাড় তুলিয়ে বলে, 'কি বলে সার?'

'তাদের অখণ্ড পরমায়ু হয়। কারণ, তাদের দেহ থেকে শেষ নিঃশ্বাস কিছুতেই বেরুতে চায় না। যতবার ছিনেজোঁকের মতো বেরুতে চাইবে, ময়াল সাপের মতো বাইরের হাওয়া গিলে নেয়। যাক, তোমার হাঁফানি রোগ আছে জেনে খুশি হলাম।'

জনার্দনবাবুকে একটু মনমরা হতে দেখা যায়। মনে মনে ভাবে আরেক বিপদ এসে হাজির। কি কুক্ষণে সাহেবকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছিলাম। এমন ডাক্তার দেখিনি। ওষুধ পত্র চুলোয় গেল শেষে কিনা কুস্তি লড়ার পরামর্শ দিল!

তবু শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক; সাহেবের মতটা যদি বদলাতে পারা যায়। জনার্দনবাবু জানালেন, হাফাঁনি রুগীরা বড় দুর্বল হয়। নিতান্তই গোবেচারা আমি...একটু যদি ভেবে দেখেন..., ভিজে চড়াই পাখির মতো জনার্দনবাবু নিজেকে কুঁকড়িয়ে নেয়। সাহেব তাঁর আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে বলে, 'তোমার মতো একজন দুর্বল লোকই চাই। কুস্তি লড়ার সময় আমাকে বেশি প্যাঁচে যাতে না ফেলে।'

'এমন ধস্তাধস্তির দরকার কি। তার থেকে একটা পাট্টাই ঘোড়া কিনুন না সার।' জনার্দনবাবু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে পরখ করতেই সাহেব জানান, 'ঘোড়ার থেকে তুমি অনেক ভাল। আজ কাল ঐসব ঘোড়াগুলো বড় অবাধ্য হয়। লাগামের বশ ওরা হতে চায় না। আর যাই হোক তুমি ওদের মতো এতটা অবাধ্য হবে না।'

'আমাকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করছেন?' জনার্দনবাবুর মুখে প্রতিবাদের সুর বেজে ওঠে।

সাহেব বিশেষ কোন কথা না বাড়িয়ে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে পা রাখে।

মেমসাহেবের সঙ্গে মোলাকাত হতেই জনার্দনবাবু মুখ কাচুমাচু করে বলে, 'ম্যাডাম, সাহেব একমাত্র আপনার বাধ্য। কোস্তা-কুস্তির মধ্যে যেন না যায় আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।'

'না, জনার্দন—' মেমসাহেবও বেঁকে বসে।

'ডাক্তারের কথা সাহেবকে শুনতেই হবে। ঘোড়ায় চড়া থেকে তোমার সঙ্গে কুস্তি লড়া অনেক ভাল।' বলেই পাশের ঘরটি দেখিয়ে মেমসাহেব বলে, 'এই ঘরটা তোমাদের কুস্তি লড়ার জন্য ঠিক করে দিয়েছি। কাল থেকেই শুরু করবে।'

জনার্দনবাবুর মুখে কোন কথা নেই। মেমসাহেবের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সামনে আয়নার দিকে তাকিয়ে ঝটিতি নিজের চেহারার প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। এ মুহূর্তে নিজেকে দেখে নিজের প্রতি মায়া হয়। কত নিরীহ এই চেহারা। সাহেবের এতটুকু মায়া হয় না তার দিকে তাকিয়ে! সাহেবগুলো এত নির্মম হয়! কোথায় হাতি আর নেংটি ইঁদুর!

পরের দিন যথাসময়ে কুস্তি শুরু হয়ে যায়।

সাহেব তাঁর দসাসই চেহারাটা সমেত কিং কঙের মতো যখন জনার্দনবাবুর শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, উলটে থাকা ব্যাঙের মতো হাত পা ছড়িয়ে ঊর্ধ্বে দুটি চোখ তুলে বড় করুণ ভাবে তাকিয়ে থাকেন তিনি। এমনি অবস্থায় মেমসাহেবকে ডেকে বলে, 'আমার বাড়িতে একটা খবর দেবেন। জানাবেন আমার জীবন খুব বিপন্ন। যে কোন মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারি।'

মেমসাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি পাঠাচ্ছি।'

জনার্দনবাবু ভাবেন এভাবে পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কোন মানে হয় না। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন, শত্রুপক্ষকে ফোঁস করে উঠতে হয়। হঠাৎ জয় রামকৃষ্ণের জয় বলে বিকট দেওয়াল কাঁপানো শব্দ তুলে এক ঝাঁকনি দিয়ে সাহেবকে ধরাশায়ী করে। বুকের ওপর বীরের মতো চেপে বসতেই মনে হয়, স্পঞ্জের গদির ওপর তিনি চড়ে বসেছেন। কি নরম শরীর! ওজনে একটু ভারি না হলে এমন একটা শরীর বুকের মধ্যে চেপে বসলে ভয়ের কোন কারণ ছিল না।

এবার সাহেবই হুঙ্কার ছেড়ে বলে, 'আমার বুকের ওপর অসভ্যের মতো বসে আছ কেন। ডাক্তার কি আমার বুকের ওপর তোমায় বসতে বলেছে?'

জনার্দনবাবু উঠে দাঁড়াতেই সাহেব কোনরকমে খুছিয়ে তুলে উঠে বসে বলে, 'তোমার সঙ্গে কুস্তি করা আমার চলবে না। তোমার শরীরে কোথায় এতটুকু মাংস নেই। বাঁশের গাঁটের মতো খোঁচা খোঁচা হাড়গুলো আমার আরও যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিল। তুমি একটা অপদার্থ!'

'আপনি যেন সার একটা জড়পদার্থ। ময়দার তাল।'

'কি বললে', সাহেব চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করতেই প্রসঙ্গে পাল্‌টে জনার্দনবাবু বলে, 'বলছিলাম সার, সেই ভাল। অযথা এত ধস্তাধস্তিতে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে একটা ঘোড়া—'

'হ্যাঁ, আলবৎ আমি ঘোড়া কিনবো।'

সাহেব এবার গোঁ ধরে কথার মাঝে কথা পাড়ে।

সাহেব এবং জনার্দনবাবু ঘোড়ার খোঁজে ঘুরতে থাকে। কলিন্স সাহেব বিরক্ত বোধ করে বলে, 'ভারতবর্ষে ঘোড়ার খুব আকাল দেখছি। আমাদের দেশে প্রতি ঘরে ঘরে ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়। ঘোড়া ছাড়া কেউ পথেই বের হয় না।'

'তাই ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হন আপনারা।' জনার্দন বাবু কথার তালে তাল লাগান। পরক্ষণে বলেন, 'সার শুনেছি টেরিটি মার্কেটে অনেক ঘোড়ার আস্তাবল আছে। যাবেন সার?' বলেই জনার্দন বাবু সাহেবকে একবার টেরিয়ে দেখে নেয়।

কথামত সাহেব টেরিটি মার্কেটে এসে হাজির হতেই ঘোড়ার আস্তাবল চোখে পড়ে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যেতেই কোথা থেকে একটা ঘোড়া চিঁ চিঁ করে সাহেবকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে।

'ঘোড়াটা অমন করে বিদঘুটে আওয়াজ কেন করছে?' সাহেব জিজ্ঞেস করতেই জনার্দনবাবু জানায়, 'আস্ত ছোলা গিলে বোধ হয় হজম করতে পারেনি। পেটের গোলমাল দেখা দিয়েছে।'

সাহেব সায় দিয়ে বলে, 'তাই হবে। আমার ঘোড়াকেও দেখছি চানা খাওয়ানো চলবে না।'

সামনে শীর্ণকায় একটি ঘোড়াকে দেখে জনার্দনবাবু জানালেন, 'এই ঘোড়াটা ভাল সার। দাম করলে হয় না?'

'এতো কয়েকদিন পর মারা যাবে।' সাহেব আপত্তি জানাতে জনার্দনবাবু বলে, 'মেডিকেল সায়েন্সে একথাও বলে, রোগা শরীরে হাড় শক্ত হয়। ওসব আপনি ভাববেন না।' পরক্ষণে নিজের দিকে আঙ্গুল উচিঁয়ে বলে, 'আমাকে দেখছেন না সার! আসামের বেত হয়ে আছি! বাঁক নেবো তবু ভাঙবো না।'

সাহেব অবশেষে জনার্দনবাবুর যুক্তিটি মানতে চায়। মানার কারণও আছে। কুস্তি লড়তে গিয়ে জনার্দন বাবুর শরীরের জোর তিনি বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। রোগা হাড়ের শক্তি তাই অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাহেব অবশেষে ঐ ঘোড়াটিকেই ঘরে তুললো। মেমসাহেব নাক সিটকে বলেছিলো, এটা কি ঘোড়া না ঘোড়ার স্কেলিটন?

জনার্দনবাবু বললেন, 'আসল আফ্রিকার ঘোড়া। রেসের মাঠে অনেক বাজি মাত করেছে। মেদবহুল ঘোড়া হলে সাহেবের অনেক অসুবিধা হবে। সাহেব মোটা ঘোড়াও মোটা শেষকালে কেউ কাউকে নিয়ে আর চলতে পারবে না। তাই.....'

পরের দিন খোলা মাঠে হাতে লাগাম নিয়ে ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে চড়তেই সে আর ছুট দিতে চায় না। এমনকি কয়েক ঘা পিঠে চাবুকের আঘাত সহ্য করেও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ আগে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই মাটি অনেক নরম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়াটির পা মাটি ফুঁড়ে বাঁশের মতো ভেতরে ঢুকে যায়। লিফ্‌টের মতো ক্রমশঃ নিচে নেমে যেতেই সাহেব বিস্ময়ে জনার্দনবাবুকে জিগ্‌গেস করে, 'আমি যেন ঘোড়া শুদ্ধ পাতাল-প্রবেশ করছি! কি হলো ব্যাপারটা?'

জনার্দনবাবু আঁতকে উঠে বলে, 'নেমে পড়ুন সার! ঘোড়ার থেকে আপনার ওজন বেশী হয়ে গেছে।'

সাহেব ধড়মড়িয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে ধরাশায়ী হলেন। জনার্দনবাবু হেঁচকে তুলতে গিয়ে বারকয়েক দম ছাড়লেন।

ঘোড়াটা ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে। তার হাটু অবধি মাটির ভেতরে। কলিন্স সাহেবের দিকে তাকিয়ে সে একবার চিঁ—চিঁ করে ডেকে উঠল।

সাহেব বিরক্তবোধ করে বলে, 'জনার্দন—ওটাকে আজই বিদেয় কর। কোস্তা-কুস্তিতে যেতে চাই না, ঘোড়াতেও চড়তে চাই না। দুটো ব্যাপারই বড় বিপদজনক। ভেবে দেখি শরীরের মেদ কমাতে তৃতীয় পন্থা কি আছে।'

জনার্দনবাবু সাহেবের কথা সকলকেই জানিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় পন্থা কি থাকতে পারে? তোমাদের যদি জানা থাকে, জানিও জনার্দন পুরকায়স্থকে। আদ্যশ্রাদ্ধ ঘাটে গিয়েই তাঁর খোঁজ করলে মিলবে। সাহেবের শরীর থেকে মেদ কেমন করে ঝরবে সেই ভাবনায় দিনে-রাতে তাঁর ঘুম নেই।

প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে ঃ বয়স চোদ্দ

বিষ্ণুদাস

পুষ্পেন্দু নারায়ণ লাহিড়ী

আজ থেকে অনেকদিন আগে একটা দেশ ছিল। দেশটার নাম পাণ্ডুপুর। সেখানকার রাজা ছিলেন "সিংহবর্মন"। তিনি খুব বীর, দানশীল এবং ধর্ম-পরায়ণ ছিলেন। দেশের সমস্ত লোক তাকে খুব শ্রদ্ধা করত। সেই রাজার রাজ্যে ছিলনা কোনো অশান্তি। সবাই একে-অপরজনের বিপদে সাহায্য করত। একদিন রাজা "সিংহবর্মন" তাঁর দেশ কি রকম উন্নতিশীল হয়েছে দেখবার জন্য মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন দেশ দেখতে। কিন্তু যখন তিনি প্রাসাদে ফিরে এলেন তখন তাঁর মন ভীষণ খারাপ কেননা তিনি সেদিন একটি বনে দেখেছিলেন —এক ব্যাধ তীর দিয়ে একটি হরিণকে আহত করেছিল, হরিণটি যখন পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিল সেই সময় ব্যাধটি ছুটে গিয়ে হরিণটিকে হত্যা করল। এই দৃশ্যদেখে রাজার মন অস্থির হয়ে উঠল। সারা-রাত জেগে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কি-করে এই জীবজন্তু হত্যা প্রতিরোধ করা যায়।

পরদিন সকাল হতে না হতেই চারিদিকে ঢ্যাঁড়া পেটানো হলো, "যে প্রাণিহত্যা করবে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে" লোক মারফত কথাটি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেল। রাজা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় নজর রাখার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

একদিন মহারাজ মন্ত্রীকে বললেন।

"মহামন্ত্রী আমি যে সব জায়গায় প্রহরী নিযুক্ত করেছি তারা ঠিক কাজ করছে কি ?"

মন্ত্রী বললেন ঃ মহারাজ নানা গুজব আমাদের কানে আসছে। কেউ বলছে প্রহরীরা ঠিক কাজ করছেনা আবার কেউ বলছে তারা ঠিক কাজ করছে। কোনটা সত্যি বলা মুস্কিল, তাই আমার মনে হয় ছদ্মবেশে প্রহরীদের পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। সেই উদ্দ্যেশেই তিনি ও তাঁর মন্ত্রী জমিদারের বেশে রাজ্য দেখতে বেরোলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এলেন রাজ্যের একেবারে শেষে এক বনে। সেই বনে পশু পাখীরা আনন্দে শান্তিতে বাস করে। সেইবনেই পাহারা দেবার জন্য তিনি এক প্রহরী নিযুক্ত করে-ছিলেন। নাম তাঁর বিষ্ণুদাস। লোকের মুখে তিনি শুনেছিলেন যে বিষ্ণুদাস খুব নিষ্ঠাবান, বীর ও নিজের কাজ প্রাণ দিয়েও রক্ষা করে। এইবার তিনি তাকে পরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রী সহকারে বনের ভেতর ঢুকলেন। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুদাস তাদের জোড়হাতে নমস্কার করল। রাজা বললেন ঃ-"তোমার নামকি বিষ্ণুদাস ?"

বিষ্ণুদাস বললেন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহারাজ তখন বললেন ঃ "আমি গোবিন্দপুরের এক-

জন জমিদার, তোমার এখানে এসেছি পশু পাখি শিকার করব বলে।"

বিষ্ণুদাস প্রত্যুত্তরে বলল :-"আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনাকে বলা যদিও আমার অনুচিত তাও বলছি এই বনে কোনো পশু পাখী শিকার নিষিদ্ধ।"

মহারাজ বললেন :-"আমি তোমায় এই দুষ্প্রাপ্য মুক্তোর মালা খুলে দিচ্ছি। তাহলে তুমি আমায় শিকার করতে দেবে ?"

বিষ্ণুদাস বলল :-"যত মহামূল্যবান সম্পদ দিননা কেন আমি এই বনে কাউকে শিকার করতে দেবনা কারণ মহারাজ আমায় এই বনের প্রহরীনিযুক্ত করেছেন যাতে কেউ এই বনে প্রাণিহত্যা করতে না পারে। সুতরাং আমি তাঁর আদেশ প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।"

মহারাজ তখন ক্রুদ্ধস্বরে বললেন : "তোমার এত বড় আস্পর্ধা! তুমি আমার মত জমিদারের আদেশ প্রত্যাখ্যান কর ? আমি তোমাকে এর উপযুক্ত শাস্তি দেব।"

বিষ্ণুদাস তখন কঠিনস্বরে বলল : আপনি যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব তবুও প্রাণ থাকতে আমি কাউকে এই বনে প্রাণীহত্যা করতে দেবনা।

মহারাজ তখন অসি বার করে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন বিষ্ণুদাসকে।

বিষ্ণুদাস অসি বার করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতেই মহারাজ তার গলায় পরিয়ে দিলেন মুক্তোর মালা এবং নিজের ছদ্মবেশ খুলে গ্রহণ করলেন আসল রূপ।

বিষ্ণুদাস অবাক! সে বলল :-মহারাজ! আপনি! আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমার ব্যবহারে আমি নিজেই খুব লজ্জিত।

মহারাজ তখন খুশী হয়ে বললেন : আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম মাত্র! সত্যই তুমি বীর, ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবান। আমি তোমার ন্যায়পরায়ণতায় ভীষণ খুশী হয়েছি। আমি কামনা করি তোমার ধর্ম, বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা চিরজীবন অটুট থাকুক। শেষে আমি তোমায় এক বিরাট উপহার দেব তাহচ্ছে স্নেহ, মায়া, মমতা এই তিনটি বিপুল ঐশ্বর্য।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ এর
পূজা সংখ্যা

থাকবে : নামী ও দামী লেখকের লেখা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ আরও সব মিলিয়ে তোমাদের মন জয় করবেই এখন থেকেই বলে রাখ যে তোমাদের কাগজ দেয়—

প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে, বয়স চোদ্দ

প্রতিশোধ

দীপেন্দ্র মুখার্জী

জনায়ের জমিদার শ্রী শশাঙ্কবাবুর একমাত্র কন্যা কুমারী "বিশাখা" গরমের ছুটিতে যখন দার্জিলিংয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল তখনি ঘটনাটা ঘটে ছিল। ছোটবেলা থেকেই বিলাতে পড়াশুনা করেছে, সব রকমের খেলাধুলায় সে বিশেষ পারদর্শিনী, দেখতেও সুন্দরী। ছোটবেলা থেকেই ঠাণ্ডাদেশে থেকে এখানকার গরম ওর পক্ষে সহ্যকরা খুবই কষ্টকর।

দার্জিলিংয়ে যাবার প্রায় একমাস আগে থেকে ও প্রায় রাতের বেলায় ওদের বাড়ির আশে পাশে আলো অন্ধকারে আবছা মানুষের ছায়া দেখতে পেত। দুর্দান্ত সাহসী মেয়ে তাই সেই ছায়া অনুসরণ করে এগিয়ে যেত, কিন্তু কোন দিন ধরতে পারত না। ওকে দেখেই অন্ধকারে সেই ছায়া মিলিয়ে যেত। একথা ও কাউকে বলেনি একমাত্র ওর বাকদত্তা 'সুনীত' ছাড়া। কারণ তাহলে সেই ছায়া সাবধান হয়ে যাবে। আরও লক্ষ্য করেছে ওর বাবা মাঝে মাঝে ফোন পেলে কেমন যেন মুষড়ে পড়েন, চোখে মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে ওঠে। তাই একদিন সরাসরি প্রশ্নকরে "আচ্ছা বাবা সব জমিদারদের, জমি টাকা পয়সা ছাড়াও এমন একটা কিছু থাকে, যে সেই জিনিসটার জন্য অনেক সময় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়? হঠাৎ এই রকম প্রশ্নে শশাঙ্কবাবু চমকে ওঠেন, আমতা আমতা করে বলেন কেন, "মামণি" তুমি আজ আমায় এই প্রশ্ন করছ? বিশাখা, বলে আমার কেন জানিনা খুব জানতে ইচ্ছে করছে। শশাঙ্কবাবু বলেন হ্যাঁ মা, তুমি ভালই করেছ, আজ আমায় এপ্রশ্নকরে কারণ তুমি বড় হয়েছ আর আমারও যাবার সময় হয়ে এসেছে, তাই তোমার সব কিছুই জেনে রাখা উচিত। শোন! তোমার মায়ের একটি নেক্‌লেশ আছে যার দাম হবে প্রায় একলক্ষ টাকার মত। তাতে আছে মনি, মুক্তা ও হীরা খোদাই করা। জড়োয়া নেকলেশ ওটি আছে আমার সিন্দুকের নীচে মাটির তলায় বাক্সে ওটা তোমার 'মা' তোমার আশীর্বাদের জন্য রেখে গেছেন।—আচ্ছা বাবা আমি মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে ওটা একবার দেখব কেমন? তারপর ও চলে যায় মামার বাড়ি।

ঠিক তিনদিনের মাথায় রাত প্রায় তখন দুইটা হবে হঠাৎ শশাঙ্কবাবু শুনতে পান কে যেন সিন্দুকটা সরাবার চেষ্টা করছে। উঠে দেখার আগেই তাকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের মতন চলে যেতে হয়। রাম, রোজ সকালের মতন চায়ের পেয়ালা এনে দেখে কর্তাবাবু মেঝের উপর পড়ে আছে আর রক্তের ধারা চাপচাপ হয়ে রয়েছে, চিৎকার করে ওঠে। সবাই দৌড়ে

আসে সুনীতকে খবর দিলে ও সাথে পুলিশকে নিয়ে হাজির হয়, সবাইকে পাওয়া যায়, শুধু ম্যানেজারকে পাওয়া যায় না। বিশাখা টেলিগ্রাম পেয়ে পৌঁছে যায় আর বাবার মৃতদেহ স্পর্শকরে প্রতিজ্ঞা করে এর 'প্রতিশোধ' সে নেবেই। পরের দিন ম্যানেজার ফিরে আসে, এসে জানায় ওর মায়ের খুব অসুখ তাই টেলিগ্রাম পেয়েই বাড়ি চলে যায়, আর হাতে খুব অল্প সময় থাকার দরুন কর্তাবাবুর সাথে দেখা করে যেতে পারে নাই। তিন, চার দিন পরে বিশাখা, দেখে সেই ছায়ামূর্তি। এবার বিশাখা হাতে ছোরা নেয়, তার চোখ দুটায় ঝলসে ওঠে ঘৃণা রাগ ও প্রতিশোধের দুরন্ত ইচ্ছা। সেও হেঁটে যায় ঐ ছায়ার দিকে তারপর লক্ষ্য করে ছোরা মারে। তা গিয়ে বিদ্ধ হয় আততায়ীর পিঠে, বাতি জ্বালিয়ে দেখে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তাদেরই ম্যানেজারবাবু মনোজ দত্ত, "বাবার হত্যাকারী"।

জানো কি ?

সোহিনী পাল

বজ্রের শব্দ শোনার পূর্বে আমরা বিদ্যুৎ চমক দেখি কেন ?

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, কিন্তু শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট মাত্র। কাজেই বজ্রপাতের আলো আগে দেখা যায়—শব্দ আসে পরে।

বর্ষাকালে ভিজা কাপড় সহজে শুকায় না কেন ?

বাতাস যত শুষ্ক হয় তত তাহার জল শুষিয়া লইবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে। ফলে তখন তাহার জল শুষিয়া লইবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়।

কুয়াসা কি ? কেন কুয়াসা হয় ?

বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আসিলেই এই জলীয় বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। এই রাশি রাশি জল-কণা বাতাসে ভাসমান অবস্থায় কুয়াসার সৃষ্টি করে।

শিলা বৃষ্টি কেন হয় ?

বৃষ্টির ফোটাগুলি প্রবল হাওয়ার বেগে উপরের দিকে ঠাণ্ডা বায়ুর স্তরে পৌঁছায়, এবং সেখানকার ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে সেইগুলি বড় বড় বরফের টুকরায় পরিণত হয়। বাতাসের বেগ কমিয়া আসিলেই বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পড়িতে থাকে।

শিশির কি ?

শিশির জলকণা। রাত্রিতে পৃথিবী যখন তাপ বিকীরণ করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তখন বাতাসের জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এইজন্য বাতাসের জলীয় বাষ্প শিশির কণারূপে ঘাসের উপর বা গাছের পাতায় দেখা যায়।

রেল লাইনের সংযোগস্থলে একটু ফাঁকা থাকে কেন ?

উত্তাপে সকল পদার্থই প্রসারিত হয়। রৌদ্রের উত্তাপে ও চলমান চাকার ঘর্ষণে রেল লাইনগুলি প্রসারিত হয়। যদি ঐ ফাঁক না থাকিত তাহা হইলে ঐ প্রসারিত রেললাইন একটি অপরটির উপর গিয়া পড়িত এবং তাহাতে রেল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকিত।

দি ফার্ষ্ট ভয়েজ অফ ক্রিষ্টোফার কলম্বাস

ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসু

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর আগেকার কথা। স্পেন দেশের দক্ষিণে একেবারে সমুদ্রের ওপর অবস্থিত একটা ছোট বন্দর, নাম পালোস। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল এক সমুদ্র অভিযান। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ অভিযান তা' সফল হয়নি বটে, কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে।

এই দুরূহ, দুঃসাহসিক অভিযানের যিনি নায়ক নাম তার ক্রিস্টোফার কলম্বাস। মানুষের জয়যাত্রার অন্যতম এক পথিকৃৎ।

কলম্বাসের জন্ম ইটালির জেনোয়া শহরে। তাঁর জন্মসাল সঠিক জানা যায় না, অনুমান করা হয় ১৪৫০ সাল। তাঁরা তিন ভাই, এক বোন। তাঁর বাবা তাঁত বোনার কাজ করতেন। এই তাঁতের কাজে কলম্বাসের কোন মন ছিল না। তিনি বাড়ি ছেড়ে প্রায়ই বেরিয়ে আসতেন সমুদ্রের ধারে।

তিনি জাহাজ ঘাটায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর অবাক বিস্ময়ে দেখতেন—অথৈ সমুদ্রের নীল জল, নানা রঙের, নানা আকারের জাহাজের মাল নিয়ে আনাগোনা—তাদের সাদা সাদা পালগুলো বাতাসে দুলতে থাকে। ঐ সমুদ্র, ঐ জাহাজ তাঁকে আকর্ষণ করতো। অগাধ সমুদ্রের মধ্যে ঐ জাহাজে করে ঘুরে বেড়াবার জন্যে তাঁর মন ছটফট করতো।

এখানেই তাঁর সারাদিন কাটতো-বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—তার অজানা রহস্য জানার আকাঙ্ক্ষায়। সে সময়ে তটভূমি ছেড়ে কয়েক মাইলের মধ্যেই জাহাজ চলাচল করতো। তার বাইরে আরো পশ্চিমদিকে সমুদ্রের ওপারে কি আছে কেউ জানতো না, জানবার কেউ চেষ্টাও করতো না।

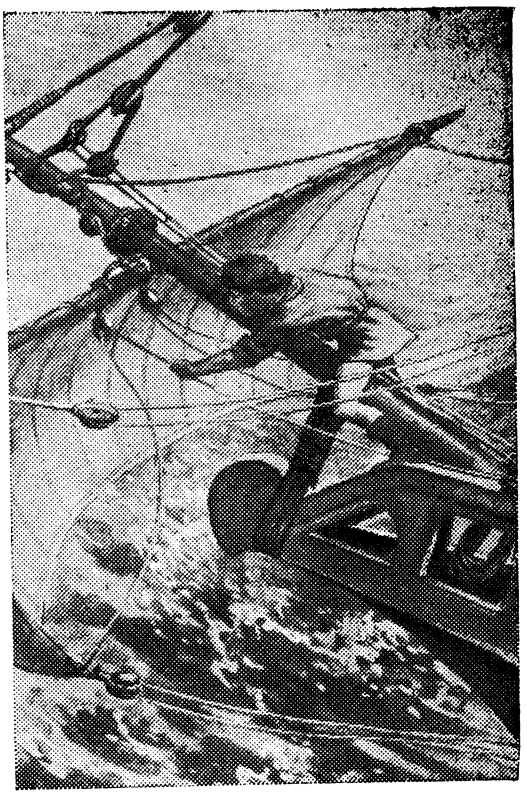

পালের দড়ি ঠিক করছে কলম্বাস

নাবিকদের সঙ্গে কলম্বাস ভাব জমাতেন। তাদের কাছ থেকে নানা গল্প শুনতেন। সমুদ্রের মধ্যে নানা দেশের কথা, বিচিত্র সে সব দেশ, সেখানকার লোক ও তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার।

এসব শুনতে শুনতে নাবিক হবার দুরন্ত বাসনা তাঁর মনে জেগে ওঠে। তাই চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি নাবিকের কাজে লেগে যান। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, স্পেন এবং ফ্রান্সের উত্তরে জাহাজে ঘুরে আসেন। এমন কি তিনি ইংলণ্ড ও সুদূর আইস-ল্যাণ্ডেও যান। একবার আফ্রিকা অভিযানে কোন-ক্রমে তিনি জল দস্যুর হাত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন।

কলম্বাস নিজের জন্মভূমি ছেড়ে কাছাকাছি পোর্টো-স্যান্টো দ্বীপে এসে বাস করতে লাগলেন। এই দ্বীপটি ছিল তখন পর্তুগালের অধীনে। এখন এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটলো যা তাঁর মনে আটলান্টিক মহাসাগর অভিযানের বাসনা আরো দৃঢ় করে তুললো।

প্রথমেই তাঁর জীবনে এক পরম সৌভাগ্য দেখা দিল। এক বিখ্যাত নাবিক ও জাহাজের ক্যাপ্টেনের মেয়েকে তিনি বিবাহ করলেন। এই বিবাহের ফলে তাঁর বিশেষ সুবিধা হলো তিনি সেখানকার নামকরা নাবিক সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি নানা ধরনের ম্যাপ ও নৌ-বিদ্যা বিষয়ে নানা তথ্য আয়ত্ত করলেন। তখনও পর্যন্ত মানুষের বায়ুর গতি ও সমুদ্র-তরঙ্গ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান ছিল তাও তিনি জেনে নিলেন।

সেই সময় ম্যাপ নাবিকদের খুব কাজে লাগতো। তাই তিনি ম্যাপ তৈরি করে জীবিকা অর্জন করতে লাগলেন। কিন্তু এই সব ম্যাপ ছিল অসম্পূর্ণ ও ভুলে ভরা। কারণ তখনও পর্যন্ত পশ্চিমদিকে ইওরোপ ও এশিয়ার মধ্যে আমেরিকা বলে যে আর একটা মহাদেশ আছে তা তারা জানতো না।

যখন তিনি ঘরে বসে এই সব ম্যাপ তৈরি করতেন তখন মাঝে মাঝে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখতেন সমুদ্রের নীল জলের দিকে। তাঁর মনে হতো, সমুদ্র যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ম্যাপের মধ্যে দিয়ে খুঁজতেন সেই পথ—যে পথ দিয়ে তিনি আটলান্টিক পার হয়ে অজানা দেশের সন্ধান খুঁজে পাবেন।

আগেকার দিনে লোকেদের পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। কেউ বলতেন পৃথিবী সমতল আবার কিছু পণ্ডিতের মতে পৃথিবী বলের মত গোলাকার। কলম্বাস বিশ্বাস করতেন পৃথিবী গোলাকার। তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল আটলান্টিক মহাসাগর ধরে সোজা পশ্চিম মুখো গেলে নিশ্চয়ই কোন দেশের সন্ধান পাওয়া যাবে। আর সে দেশ এশিয়া, যেখানে আছে ভারতবর্ষ। কোন কোন অভিযাত্রী পুব মুখো স্থলপথ ও জলপথ পেরিয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু সীমাহীন মহাসাগর অতিক্রম করে পশ্চিম মুখো জল পথে যাবার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর।

ইওরোপ ও এশিয়ার মধ্যে আর কোন দেশ থাকতে পারে সেরকম স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও লোকেদের বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই কোন মাটির দেশ আছে। কারণ পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের জলে অদ্ভুত সব জিনিস ভেসে আসতে দেখে নাবিকেরা। অনেক সময় অজানা পাখির দল উড়ে আসে এই সব দেশ থেকে।

কলম্বাস প্রায়ই সমুদ্রের ধারে এসে নাবিকদের সঙ্গে গল্প করতেন। তারা তাঁকে আশ্চর্য জিনিস

দেখাতো। ছোট ছোট কাঠের ওপর খোদাই করা বিচিত্র মূর্তি, ফাঁপা বাঁশের টুকরো যার মধ্যে প্রচুর জল ধরতে পারে। সাগরের জলে ভেসে আসা নানা রকমের লতাপাতা।

এ সমস্ত তাঁকে আরো উৎসাহিত করতে লাগলো। তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো—অসীম জলরাশির মধ্যে নিশ্চয়ই দেশ আছে। তাঁর সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রইলো এসব অজানা রহস্য উদ্ধারে।

কিন্তু তিনি ত একজন সাধারণ গরীব লোক। লোকবল, অর্থবল তাঁর কিছুই নেই। কেবল উৎসাহ ও অদম্য সাহস নিয়ে অজানার উদ্দেশে অভিযান করা যায় না। এর জন্য দরকার জাহাজ, লোকজন, অভিজ্ঞ নাবিক—আর সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থ। এমন এক উদ্যোগে সাহায্য করতে পারে কেবলমাত্র দেশের রাজা। সেইজন্যে ঠিক করলেন তিনি পর্তুগালের রাজার কাছে যাবেন।

দ্বিতীয় জন তখন পর্তুগালের রাজা। কলম্বাস তাঁর অন্তরের বাসনার কথা রাজাকে জানালেন। রাজা সব শুনলেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। এদিকে রাজা নতুন দেশ আর সম্পদের লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি গোপনে কিছু নাবিককে পাঠালেন। তারা কয়েকদিন পর নিরাশ হয়ে ফিরে এলো।

কলম্বাস এই প্রবঞ্চনার কথা জানতে পেরে রাগে ও ঘৃণায় তাঁর মন ভরে উঠলো। তিনি পর্তুগাল ত্যাগ করে বিভিন্ন রাজার কাছে দরবার করলেন। সকলেই তাঁকে উন্মাদ বলে প্রত্যাখ্যান করলেন।

কলম্বাস দমে যাওয়ার পাত্র নন। তাঁর অন্তরে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বিশ্বাসের ওপর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি ফিরে এলেন তাঁর নিজের দেশ স্পেনে।

রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড তখন স্পেনের সিংহাসনে। কলম্বাস দু'বছর ধরে অপেক্ষা করে শেষে রাজার কাছে যাবার অনুমতি পেলেন। ভাবলেন তাঁর আশা হয়তো এবার সফল হবে।

ইতিমধ্যে বর্বর মুর জাতি স্পেন আক্রমণ করে। রাজা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। যা হোক রাজা কলম্বাসের কথা শুনে এক পরিষদ বসালেন। সেই পরিষদ রাজাকে কলম্বাসের অভিযানের বিষয় তাঁকে উপদেশ দেবে।

বৃথাই কলম্বাসের আশা। সেই পরিষদ স্পেনের একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দিনের পর দিন কলম্বাস তাদের কাছে

নাবিকদের নিয়ে আসা জিনিস দেখছেন কলম্বাস

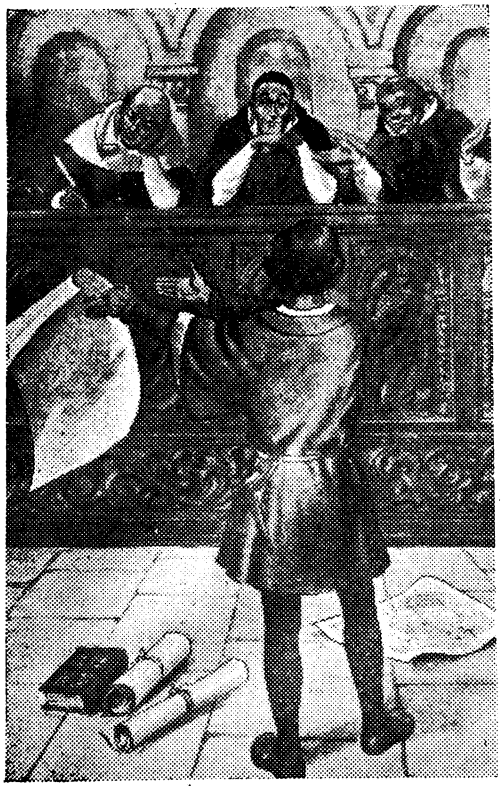

পরিষদের কাছে কলম্বাসের সাক্ষ্য

যুক্তি-তর্ক করে, অনুনয় বিনয় করেও কোন ফল পেলেন না।

ধীর গতিতে চ'লে দীর্ঘ চার বছর পর পরিষদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লো যে কলম্বাসের অভিযান উদ্ভট ও অবাস্তব।

কলম্বাস কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন না। তিনি বুঝতেই পেরেছিলেন রাজার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবেন না। অন্য উপায়ের সন্ধানে তিনি ঘুরছিলেন।

কলম্বাসের এক ভাই ছিল নাম তার বার্থলোমিও। তার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, পরিষদের সিদ্ধান্ত না বেরনো পর্যন্ত তিনি স্পেনেই থাকবেন। আর তাঁর ভাই ইংলণ্ডের রাজার কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

টিউডর বংশীয় রাজা সপ্তম হেনরী তখন ইংলণ্ডেশ্বর। তিনি খুব সাবধানী লোক ছিলেন বিশেষ করে টাকা পয়সার ব্যাপারে। বার্থলোমিওর কথা রাজা ধৈর্যের সঙ্গে শুনলেন। শেষে অনিশ্চয়তার অজুহাত দেখিয়ে কোন সাহায্য করলেন না।

ইংলণ্ডে নিরাশ হয়ে তিনি ফ্রান্সে রাজা অষ্টম চার্লসের কাছে গেলেন। সেখানেও তিনি ব্যর্থ হলেন। সব খবরই কলম্বাসের কাছে গিয়ে পৌছলো।

এদিকে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ ধীরে ধীরে কলম্বাসের সমস্ত উদ্যমকে ঘিরে ফেলতে লাগলো। স্পেনের রাজার প্রথম পরিষদ তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে ছিল। দ্বিতীয় পরিষদও একই পথে গেল।

স্পেনে যখন তিনি কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না তখন তিনি মনস্থ করলেন ফ্রান্সে তাঁর ভাই-এর কাছে যাবেন। তিনি পালোস শহরে এসে পৌছলেন। বিফল মনোরথে ও পথশ্রমে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে একটা মঠের কাছে এসে আর এগোতে পারলেন না। এই মঠের নাম লার‍্যাবিডা। কলম্বাসের সৌভাগ্যের চক্র এখান থেকেই আবর্তিত হয়েছিল।

জোয়ান পেরেজ ছিলেন মঠাধ্যক্ষ। তিনি স্পেনের রাণী ইসাবেলার বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন।

ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত কলম্বাসকে দেখে তাঁর দয়া হলো। তিনি তাঁকে রুটি ও জল খেতে দিলেন। আহারান্তে কলম্বাস তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বললেন। সন্ন্যাসী বুঝলেন যে দুরন্ত আশা তাঁর বুকে বাসা বেঁধেছে তা সহজে নষ্ট হবার নয়। যার অসীম ধৈর্য,

অমানুষিক সাহস ও মৃত্যুঞ্জয়ী পণ তার অসাধ্য সাধন করার পথে কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাঁকে স্পেন ত্যাগ না করতে পরামর্শ দিলেন। কলম্বাসকে আশ্বাস দিলেন, রাণীর কাছে সাহায্যের জন্যে তিনি অনুরোধ করবেন।

সন্ন্যাসীর আবেদনে রাণী ইসাবেলা সাড়া দিলেন। উপযুক্ত পোশাক ও অশ্ব পাঠিয়ে তাঁকে দরবারে উপস্থিত হবার জন্যে সন্ন্যাসীকে বললেন।

রাণী ইসাবেলা নিভৃতে কলম্বাসের অভিযানের কথা শুনে খুব উৎসাহ দেখালেন। পরে দরবারে গিয়ে কলম্বাস আশ্চর্য হয়ে গেলেন—যেন এক যাদুমন্ত্রে সব কিছুই তাঁর পক্ষে রায় দিচ্ছে।

স্পেনের রাজা ও রাণী কলম্বাসের আটলান্টিক অভিযানে সমস্ত সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হলেন। সাত বছর ধরে যে আশার মুকুল কলম্বাসের মনে ফুটেছিল তার পূর্ণবিকাশের সম্ভাবনা আজ দেখা গেল।

তাঁরা আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন—তাঁর আবিষ্কৃত নতুন দেশে স্পেনের প্রতিনিধি হয়ে তিনি থাকবেন, পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে স্পেনের নৌ-বাহিনীর তিনি হবেন সেনাধ্যক্ষ, সে সব দেশের সমস্ত অর্থ ও সম্পদের দশ ভাগের একভাগের অংশীদার তিনি হবেন।

প্রথমে শর্তগুলি মানতে তাঁরা রাজী হ'ন নি। কলম্বাস রাজ দরবার থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু বেশীদূর না এগোতেই এক রাজকর্মচারী তাঁকে রাজার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। পুরস্কার স্বরূপ তার সমস্ত দাবী তাঁরা মেনে নিলেন।

সেই সময় পালোস শহরের অধিবাসীদের অনেকেরই রাজকর বাকি পড়েছিল। রাজার হুকুমে সমস্ত শহরবাসীদের ওপর শাস্তির বোঝা নেমে এলো। অর্থাৎ যাকে বলে 'পিটুনি কর'। এরকম প্রথাই তখন চালু ছিল। শাস্তি স্বরূপ কলম্বাসকে তিনটি জাহাজ ও তার প্রয়োজনীয় নাবিক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হবে শহর বাসীদের।

রাজার দরবার থেকে পালোস শহর অনেক দূরে অবস্থিত। তাই শহরবাসীরা যেমন রাজকর দিতে অনিচ্ছুক তেমন রাজার আদেশ মানতেও তারা অনিচ্ছুক। কলম্বাস তাদের কাছে প্রথমে অনুরোধ করে ফল পেলেন না। তখন তিনি রাজার লিখিত আদেশ তাদের সামনে ধরলেন। তারা সে আদেশ-নামা হেসে উড়িয়ে দিলো।

এই সময়ে তিনি দুই ভাই-এর সঙ্গে পরিচিত হলেন। তারা দক্ষ ক্যাপ্টেন ; শুধু তাই নয়—তারা জাহাজের মালিকও। তাদের সাহায্যে তিনটি ছোট জাহাজ জোগাড় হলো। জাহাজ তিনটির নাম—'সান্তা মেরিয়া', 'পিন্টা' ও 'নিনা'। সমুদ্র অভিযানের ইতিহাসে এই জাহাজ তিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

'সান্তা মেরিয়া' জাহাজটি তিনটির মধ্যে বড়, 'পিন্টা' এর অর্দ্ধেক আর 'নিনা' এত ছোট যে মাত্র আঠার জন নাবিকের উপযুক্ত। এত ছোট আয়তনের জাহাজে আজকের দিনে অতি বড় দুঃসাহসীও অভিযানে যেতে সাহস করবেন না। এই রকম খেলনার জাহাজে কলম্বাস এক মৃত্যু-সঙ্কুল অজানা তরঙ্গের রাজ্যে অভিযানে ব্রতী হলেন। খুব কম লোকই আশা করেছিল যে তিনি ফিরে আসবেন।

জাহাজ যোগাড় হলো বটে কিন্তু নাবিক পাওয়া যায় না। দুই ক্যাপ্টেন ভাই নাবিকদের অনেক বোঝাতে লাগলো। তাদের নানাভাবে উৎসাহিত

করলো, টাকার লোভ দেখালো, কিন্তু কেউই তাদের ডাকে সাড়া দিল না। কিছু নাবিক রাজ আদেশের চাপে প্রথমে রাজী হয়েছিল কিন্তু অভিযান যতই এগিয়ে আসতে লাগলো তারা নানা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে গেল।

কলম্বাস ভাবলেন, শেষে নাবিকের অভাবে কি তাঁর অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে? তিনি বিচলিত হলেন না। রাজার কাছে গিয়ে জানালেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে থেকে তিনি নাবিক বাছাই করবেন। যারা যেতে সম্মত হবে তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। এতে কাজ হ'লো। কিন্তু নব্বইজনের বেশী নাবিক পেলেন না।

সে সময় ধর্মভীরু লোকেদের মনে একটা অহেতুক ভয় বাসা বেঁধেছিল। কেউ মনে করতো অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া একটা অপরাধ। আবার কেউ সমুদ্রের ঝড়-তুফান, জলদৈত্য আর ভয়ঙ্কর সব জল জন্তুর ভয়ে ভীত হয়ে মহাসাগরে বেশীদূর যেতে সাহস পেত না।

যাই হোক, পুরস্কারের লোভ তারা ছাড়তে পারলো না। রাজী হয়ে কলম্বাসের অভিযানে সঙ্গী হলো। প্রচুর খাদ্য সামগ্রী জাহাজে রাখা হলো যাতে করে একবছর তাঁদের কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়। এর মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণে আদা ও পনীর। তেল ও ভিনিগার—যা সমুদ্রে অতি প্রয়োজনীয়।

তখনকার দিনে একজন নাবিকের নিত্য বরাদ্দ খাদ্য ছিল—এক পাউণ্ড বিস্কুট, চার পাইট মদ ও এক পাউণ্ডের দুই তৃতীয়াংশ মাংস।

সব কিছু প্রস্তুত করার পরেও একটি অবশ্য করণীয় কাজ থাকে। সেটা হচ্ছে, অজানা অভিযানে নাবিকেরা ভগবানের হাতে তাদের সপে দেয়। সেই জন্যে অভিযান শুরু করার আগে কলম্বাস ও তাঁর নাবিকেরা শহর বাসীদের সঙ্গে মিলে লা র‍্যাবিডা মঠে গিয়ে ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অগস্ট একশো কুড়ি জন লোক নিয়ে সূর্য ওঠার আধ ঘণ্টা আগে পালোস বন্দর থেকে কলম্বাস যাত্রা করলেন।

জাহাজের ওপরে নাবিকেরা কাজে ব্যস্ত। কেউ পাল খাটাচ্ছে, কেউ দড়িকে গুটিয়ে নোঙর তুলছে। নবীন সূর্যের রক্তিম আভা তাদের মনে নতুন আশা ও উদ্যম জাগিয়ে তুললো।

একজনই কেবল নির্ভীক ও আনন্দময়। অসাধ্য

রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরছে কলম্বাস : রাজার লোক তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

সাধন ব্রতে যিনি জীবন উৎসর্গ করতে চলেছেন—তিনি হলেন কলম্বাস।

পালোস বন্দর ছাড়বার পর তিনি ভেবেছিলেন সব গণ্ডগোলের অবসান হলো। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল হয়েছিল।

প্রথম তিনদিন নির্বিঘ্নেই কাটলো। পশ্চিমের সমুদ্রে দূরতম জানা দেশ ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ—সেই দিক লক্ষ্য করেই জাহাজ চলতে লাগলো। সবচেয়ে দ্রুত-গামী জাহাজ—'পিণ্টা' আগে যাচ্ছে। নীল-ধোঁয়াটে দূর দিক চক্রবালের পশ্চাৎপটে ঢেউ-এর সঙ্গে নাচতে নাচতে চলেছে 'পিণ্টা'। তার সাদা পাল মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে—আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

'সান্তা মেরিয়া' জাহাজের ডেকের ওপরে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ কলম্বাস দেখলেন দূরে 'পিন্‌টা' নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুঝলেন নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। তাড়াতাড়ি 'সান্তামেরিয়া' জাহাজটিকে তার পাশে আনলেন। দেখলেন 'পিন টা' জাহাজের হালে গোলমাল।

তিনি স্পষ্টই বুঝলেন ইচ্ছাকৃতভাবে এমন জোড়াতালি দিয়ে কাজ করা হয়েছে যাতে জাহাজ বেশীদূর যেতে না পারে—ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কোন রকমে ক্যানারী দ্বীপে পৌছে সেখানে একমাস ধ'রে 'পিণ্টা' এবং 'নিনা'র নানা দোষ ত্রুটি সারানো হ'লো। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে আবার যাত্রা শুরু হ'লো।

ধীরে ধীরে তটভূমি দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেলো। যতই গভীর সমুদ্রে যেতে লাগলেন ততই তার ভীষণতা চোখে পড়তে লাগলো। সমুদ্রের এমন চেহারা নাবিকেরা আগে কখন দেখেনি—আতঙ্কে তারা শিউরে উঠলো।

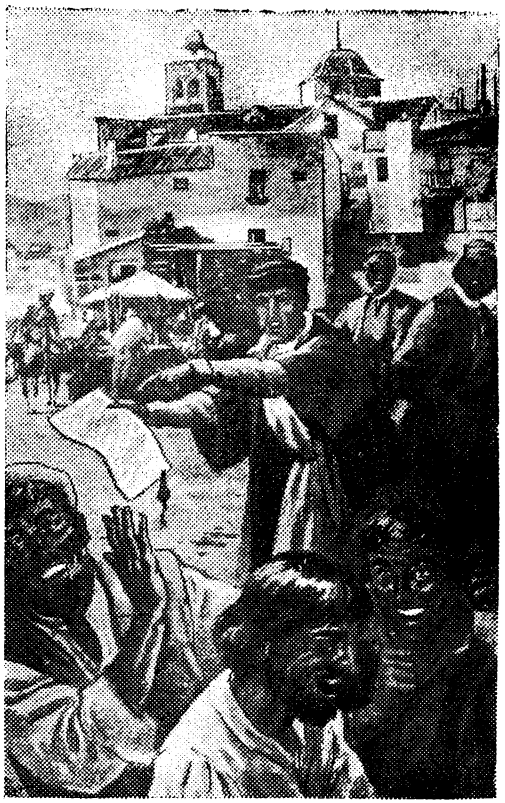

রাজাদেশ অমান্য করছে পালোসের বাসিন্দারা

প্রতিদিনের সূর্য ও তারার গতিবিধি লক্ষ্য করে কলম্বাস জাহাজের অবস্থান লিখে রাখতেন ফলে কতটা পথ পাড়ি দেওয়া হয়েছে তা বোঝা যেত। নাবিকেরা যদি প্রকৃত দূরত্ব জেনে পাছে আর এগোতে না চায় সেই জন্যে তিনি দুটি 'লগ-বই' তৈরি করেন। আসলটি লুকিয়ে নকলটিতে তিনি কম দূরত্ব রাখতেন।

ক্যানারী দ্বীপ ছেড়ে আসার সাতদিন পর কলম্বাস জাহাজের কম্পাসে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন। কম্পাসের কাঁটা ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য না করে একটু উত্তর-পশ্চিম দিকে হেলে রয়েছে। ক্রমশ এটা আরো পশ্চিমে যাচ্ছে।

কলম্বাস নিজেই বুঝতে পারেন নি কেন এ রকম হচ্ছে। কিন্তু তিনি ক্যাপ্টেন—কোন দুর্বলতা তাঁর পক্ষে ঠিক নয়। তাই তিনি নাবিকদের জানালেন এটা কম্পাসের দোষ নয়—ধ্রুবতারা সময় সময় স্থান পরিবর্তন করে। সৌভাগ্যবশত নাবিকেরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করলো।

এখন আমরা জানি, জাহাজের কম্পাসে যে উত্তর দিক চিহ্নিত হয় সেটা আসল উত্তর দিক নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ইহা নির্দেশিত হয়।

নাবিকেরা তখনকার মত সন্তুষ্ট হলো বটে কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে অজানা আশঙ্কা প্রকাশ করতে লাগলো। এমন কি কিছু নাবিক প্রকাশ্য বিদ্রোহ করার জন্যেও তৈরী হোল। তারা কলম্বাসকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে স্পেনে ফিরে যাবার ষড়যন্ত্র করলো।

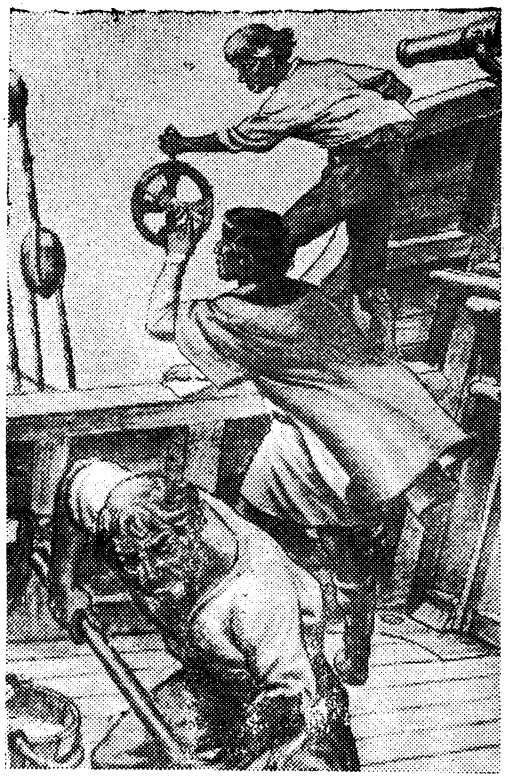

কলম্বাস দিগদর্শন যন্ত্রে দেখছেন

নাবিকদের মনে উৎসাহ জাগাবার জন্যে কলম্বাস ঘোষণা করলেন, যে আগে পশ্চিম দিকে ডাঙা দেখতে পাবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন নাবিক হঠাৎ চিৎকার করে বললো দূরে সে ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছে। একথা শুনে কলম্বাস নতজানু হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন। নাবিকদের মধ্যে উল্লাস দেখা দিলো। তিনটি জাহাজের নাবিকেরা ভগবানের স্তুতি করতে লাগলো। জাহাজের ওপরে সকলে ভোর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু সকাল হলে তারা কোন ডাঙা দেখতে পেলেন না। প্রকৃত পক্ষে নাবিকটি রাতে অন্ধকার দিগন্ত রেখায় মেঘকে দেখে ডাঙা মনে করেছিলো।

ভীত লোকের মনে আশার কারণও বিভীষিকার রূপ নিয়ে দেখা দেয়। নাবিকেরা আর এগোতে চাইলো না। বাড়ি ফেরার জন্যে তারা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। হঠাৎ একদিন তারা কতকগুলি পাখি উড়ে যেতে দেখলো। আবার তাদের মনে আশা জেগে উঠলো। কারণ কলম্বাস বলেছিলেন, যদি পাখি দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে কাছেই কোন মাটির দেশ আছে।

শান্ত সমুদ্র দেখে নাবিকেরা আশ্বস্ত হলো। সেদিন ছিল পঁচিশে সেপ্টেম্বর। নাবিকেরা বুঝতে পারেনি তাদের আরো আঠারো দিন এইভাবে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, তবে তারা মাটি দেখতে পাবে।

এক সপ্তাহ পার হলো—আরো একসপ্তাহ গেল।

কিন্তু তবুও ডাঙার কোন চিহ্ন নেই। নাবিকেরা আর কলম্বাসের কথায় বিশ্বাস করতে পারলো না। তারা দল বেঁধে দাবি জানালো—বহুদিন তারা ঘর বাড়ি ছাড়া—এ অভিযান এখনই বন্ধ করা হোক। কলম্বাস বুঝতে পারলেন তাদের মনের অবস্থা। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তাদের উৎসাহিত করতে। এমন সময়ে 'পিণ্টা' জাহাজ থেকে সংকেত এলো—সমুদ্রের ঢেউ-এ একটা গাছের ডাল ভেসে চলেছে তাতে রোজবেরী ফল তখনও লেগে রয়েছে, সেদিন রাত্রে কেউ আর ঘুমলো না।

রাত দশটা। কলম্বাস একেলা জাহাজের ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মনে নানা চিন্তা-ভাবনা। হঠাৎ দূরে তিনি একটা আলোর বিন্দু দেখতে পেলেন। আলোটা যেন চলাফেরা করছে। কলম্বাস একজন নাবিককে ডেকে দেখালেন। আর একজনকে দেখতে বললেন। কিন্তু হায়! ততক্ষণে আলো অদৃশ্য হয়েছে। এটা কি কোন মরীচিকা। কলম্বাস কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না।

সারারাত কলম্বাস দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশা নিরাশার দোলায় দুলছে তাঁর মন। জাহাজের গতি ধীর করবার আদেশ দিলেন। সত্যি যদি কোন মাটি সামনে থাকে জাহাজ যেন ধাক্কা লেগে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়—কারণ অন্ধকারে বেশী দূরের কিছু দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না।

ক্রমে রাত্রি শেষ হলো। পূব আকাশ রঞ্জিত হয়ে উঠলো—কিন্তু পশ্চিম আকাশ তখনও ঘন অন্ধকারে আবৃত।

এমন সময় 'নিনা'র জাহাজের এক নাবিক মাস্তুলের ওপর আনন্দে চিৎকার করে উঠলো—পেয়েছি! পেয়েছি! ঐ দূরে মাটি দেখতে পেয়েছি!

কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিক দেখাচ্ছে না

হ্যাঁ, সত্যি দেখা গেল মাটির দেশ! উল্লাসে, আনন্দে, আবেগে সকলেই আত্মহারা। কতদিন পর তারা মাটির মুখ দেখলো। এতদিন তারা কখন মাটি ছাড়া হয়নি—কয়েকঘণ্টা, অথবা খুব বেশী দু'তিন দিন।

নতুন মাটি, নতুন দেশ—সেদিন ছিল বারোই অক্টোবর, ১৪৯২ সাল। একটা ছোট্ট নৌকতে করে কলম্বাস তীরে এসে নামলেন। পরনে তার স্পেনের জাতীয় পোশাক। হাতে জাতীয় পতাকা। সঙ্গে তাঁর দুই ক্যাপ্টেন ভাই—দুজনের হাতে দুটি পতাকা। পতাকায় আঁকা সবুজ রঙের ক্রস, একটিতে লেখা 'F' অপরটিতে 'I' ফার্ডিনাণ্ড ও

ইসাবেলার নামের আদ্য অক্ষর। কলম্বাস দ্বীপটির নাম দিলেন 'সান্ সালভাডোর'।

তীরে নেমে, নতজানু হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন কলম্বাস। দুচোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে আনন্দাশ্রু। সকলেই প্রার্থনা জানালেন ভগবানের উদ্দেশে।

কলম্বাসের ধারণা হয়েছিল তিনি ভারতবর্ষ বা তার কাছাকাছি কোনদেশে পদার্পণ করেছেন। তাই তিনি সেই দেশগুলিকে 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' আখ্যা দিয়ে ছিলেন—কলম্বাসের এই ভুল, ইতিহাসে রয়ে গেল অক্ষয় হয়ে।

পাঁচ সপ্তাহ সমুদ্রের লোনাজলে ভেসে থাকার পর

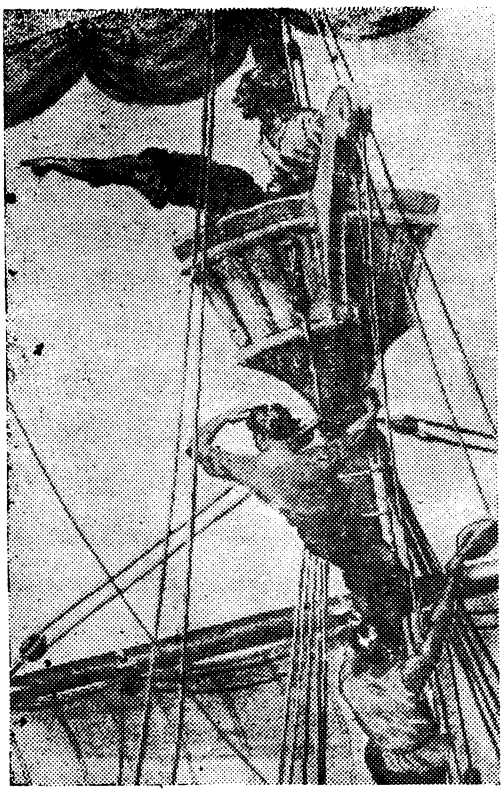

ওই ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে

মাটির দেশ দেখে তারা নতুন করে জীবন ফিরে পেল। নীল সমুদ্র তীর ঘিরে মালার মত সবুজ গাছের সারি। রঙ বেরঙের ফুলে ভরা সেসব গাছ কখনও তারা দেখেনি। তাদের কাছে স্বর্গ বলে মনে হলো।

সেই দেশের অধিবাসীরা তীরে এসে ভীড় করেছে। তাদের মনে কোন ভয় নেই। গায়ের রঙ সাদাওনয়, কালোও নয়—মেটে রঙের চামড়া। বড় বড় চুল, মুখের চারপাশে বিচিত্র রঙ করা। তাদের হাতে শক্ত ডালে তৈরী বর্শা, মুখে ছুঁচলো হাঙরের দাঁত বসানো। তারা কোনদিন সাদা লোক দেখেনি। আশ্চর্য হয়ে তাদের দেখতে লাগলো। কলম্বাস তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেন। পুঁতির মালা, ঝিনুকের মালা, আরও কত জিনিস তাদের উপহার দিলেন। তারাও খুব আনন্দিত হলো।

স্পেন দেশীয়রা আফ্রিকার উপকূলে বন্য লোকদের দেখেছে। কিন্তু এখানে যা কিছু দেখছে তাই তাদের কাছে নতুন লাগছে। দ্বীপের অধিবাসীরা এক রকম গাছের পাতা গোল করে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া মুখ দিয়ে টানছে আর বার করছে। এ দেখে তারা আশ্চর্য হলো। এই পাতাই হচ্ছে তামাক পাতা—যা কলম্বাসের সঙ্গে প্রথম ইওরোপে প্রবেশ করলো।

কলম্বাস ও তাঁর নাবিকেরা দ্বীপের চারপাশে ঘুরে দেখলেন। কিন্তু তাঁর কল্পিত সোনার খনির সন্ধান কোথাও পেলেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন কিছু লোকের গায়ে সোনার গয়না। জিজ্ঞাসা করে জানলেন আরো দক্ষিণে একটা বড় দ্বীপ আছে, নাম তার 'কিউবা'। সেখানেই আছে সোনার খনি।

দুমাস ধরে কাছাকাছি অনেক ছোট ছোট দ্বীপ

কলম্বাস নতুন দেশের তীরে নেমেছেন

তিনি আবিষ্কার করলেন। সোনা ত তিনি পেলেন না বরং এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন।

'সান্তা মেরিয়া' জাহাজের চালকের অসাবধনতা বশত জাহাজটি 'সান ডোমিংগো' দ্বীপে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কলম্বাস তখন যতটা সম্ভব জিনিস পত্র সরিয়ে এনে 'নিনা' জাহাজে তুললেন। তারপর সমুদ্রের ধারে ছোট দুর্গ তৈরি করে সেখানে চল্লিশ জন নাবিককে রেখে তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

আট মাস পর 'নিনা' জাহাজ পালোস বন্দরে এসে নোঙর ফেললো। জাহাজ ঘাটায় এক বিরাট জনতা তাঁদের বিপুল সম্বর্ধনা জানালো।

কলম্বাস পালোস থেকে যাত্রা করলেন সোজা স্পেনের রাজ দরবারে। পথে বার্সিলোনা শহরে তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হলো। নাবিকেরা নানা রকমের পাখি, ছোট ছোট জন্তু, বিচিত্র অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্র সে দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলো, সেগুলো সঙ্গে নিয়ে কলম্বাসের সঙ্গে তারা রাজাকে উপহার দেবার উদ্দেশ্যে চললো। কলম্বাস সে দেশের কয়েকজন অধিবাসীকেও সঙ্গে এনেছিলেন। শহর-বাসীদের সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো সেই ইণ্ডিয়ানরা। পরে তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

রাজা ও রাণী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কলম্বাসের ফিরে আসার খবর তাঁরা আগেই পেয়ে-ছিলেন। কলম্বাস যুদ্ধজয়ী বীর সেনাপতির মত যখন দরবারে প্রবেশ করলেন তখন রাজা ও রাণী সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে ডানদিকে বসালেন। রাজা তাঁকে নৌ-বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে ডিউকের পদে ভূষিত করলেন।

কলম্বাসের রঙীন স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ায় সারা বিশ্বে তিনি এক অমর কীর্তি রচনা করেন। অসীম ধৈর্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কঠোর পরিশ্রম অবশেষে তাঁকে যশের উচ্চ শিখরে, অক্ষয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

—*—

নিশীথ রাতে টুটুল

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে টুটুল অনেক রাতে চুপি চুপি ছাদে এসে দাড়াল।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, ফুটফুটে আলোয় ভেসে যাচ্ছে সারা ছাদটা।

টুটুলের বাবা এক সরকারী অফিসের মস্ত অফিসার, মাও চাকরী করেন। বাড়ি, গাড়ি, টিভি, ফ্রিজ কোন কিছুরই অভাব নেই ওদের। টুটুলের বয়স এখন সবে আট পেরিয়ে নয়। এরই মধ্যে নানা দামী দামী খেলনায় ভরে গেছে ওর ঘরটা, তবু টুটুলের মনে শান্তি নেই। ও বড় একা, সারা দিনে ওর বাবা মার সঙ্গে দেখা হয় না। ওরা দুজনেই বেরিয়ে যান সাত সকালে, ফেরেন রাত্তির বেলা। টুটুল তখন ঘুমে ঢুলে পড়ে। একটা ঠিকে কাজের লোকই দেখা শোনা করে টুটুলের। স্কুলে নিয়ে যায়, ফিরিয়ে আনে, সে আবার বেজায় ঘুম কাতুরে। স্কুল থেকে ফিরে সারাটা দিন একা একাই ঘরের মধ্যে কাটে টুটুলের। একটা বোনও নেই যে খেলা করবে। আশ-পাশের ফ্ল্যাটের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেশাও বাবা-মা পছন্দ করেন না। বলেন, সারাদিন নিজের পড়াশুনা, খেলনা, কমিকস-এর বই এসব নিয়ে থাকতে পার না টুটুল? সত্যিই দিনে দিনে পড়ার যা চাপ বাড়ছে, অন্যদিকে মন দেবার সময়ই থাকে না। তবু টুটুলের মনটা ছটফট করে।

টুটুল আকাশের মস্ত চাঁদটার দিকে তাকায়। আরও ছেলেবেলায় ঠাকুমা চাঁদবুড়ির গল্প করতেন। সেই বুড়ি নাকি চাঁদের মধ্যে বসে চরকা কাটে। একদিন তা শুনে মা ঠাকুমাকে খুব বকেছিলেন, শিশুদের এসব মিথ্যে গল্প শোনাতে নেই। সবাই জানে চাঁদে জল বাতাস নেই। ওখানে চরকা বুড়ি আসবে কোথা থেকে?

ঠাকুমা গত দুবছর যাবৎ কাকার কাছে আছে। টুটুলের কাকা গরীব চাকুরে। একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাকার বাড়িতে গিয়ে টুটুল দেখে এসেছে —কাকার ছেলে বাবলু ঠাকুমার কোলে বসে চাঁদ-বুড়ির গল্প শুনছে। কই, কাকিমাতো কিছু বলে না।

ওই চাঁদটার দিকে তাকিয়ে টুটুল ভাবে, নাইবা রইলো চরকা বুড়ি ওখানে, তবু শুনতে তো ভাল লাগে। ভাবলেই মনটা কেমন নরম কল্পনায় ভরে যায়।

হঠাৎ চমক ভাঙলো টুটুলের।

আকাশ থেকে বেলুনের মতো কি ওটা নেমে আসছে?.....না, বেলুন তো নয়,—বরং সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদের মতো স্বচ্ছ দেখতে বিরাট ওর আকার।

স্বচ্ছ বুদ্‌বুদটা ধীরে ধীরে টুটুলের সামনে এসে থামলো।

ওমা! ভেতরে কি সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে।

টুটুলেরই বয়সী হবে, স্বচ্ছ বুদ্‌বুদের আবরণ সরিয়ে সে নেমে এল ছাদের মেঝেতে।

টুটুল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, কে ও? নরম জ্যোৎস্নার মতো গায়ের রঙ, সুন্দর দুটি চোখ, ডালিম ফুলের মতো টসটসে ঠোঁট, একমাথা ঝাঁকড়া চুল।

মিষ্টি হেসে ছেলেটা টুটুলের আরও কাছে এগিয়ে এল, তারপর বললো খুব অবাক হয়েছ, তাই না? হবারই কথা, আমি এসেছি তোমাদের এই পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরের এক গ্রহ থেকে।

—কেন? কেমন যেন ঘোর লাগা কণ্ঠে প্রশ্ন করে টুটুল।

সেই গ্রহান্তরের আগন্তুক ছেলেটা যা শোনাল তা সত্যিই বড় অদ্ভুত।

এই বিশাল বুদ্‌বুদটা আসলে এক 'সময় যান'। কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরত্ব এক নিমেষেই পার হতে পারে। যে এসেছে তার নাম ঝিলম। সময় যান-এ চড়ে সে এখানে এসেছে এই গ্রহের এক শিশুর জীবন সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। এটা নাকি পৃথিবীর সভ্যতা থেকে কয়েক লক্ষ বছর এগিয়ে থাকা তাদের গ্রহের শিক্ষা পদ্ধতিরই অঙ্গ। টুটুলকে ঝিলম অনুরোধ করলো তিনদিনের জন্য টুটুলের প্রতিরূপ হয়ে এখানে থাকতে দেবার জন্য।

—'প্রতিরূপ' হয়ে মানে?

—তাও জান না? ঝিলম বললো, এই তিনদিন আমি সম্পূর্ণ ভাবে তুমি হয়ে এখানে থাকবো। তোমার বাবা মা আমাকে তুমি বলেই মনে করবেন। তারপর তিনদিন তুমি হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি ফিরে যাব আমার শিক্ষকদের কাছে।

—আর আমি থাকবো কোথায়? টুটুল প্রশ্ন করে।

—কেন, তুমি এই তিনদিন থাকবে আমার গ্রহে।

ব্যাপারটা ভাবতেই টুটুলের ভারী মজা লাগলো। একঘেয়ে জীবনে এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলে তো বেশ হয়!

ওমা! ঝিলম অমনি ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে কি একটা যন্ত্র বার করে তা থেকে দুটো শিরস্ত্রাণ মতো জিনিস বার করে একটা টুটুলের মাথায় আর অন্যটা নিজের মাথায় পরে যন্ত্রের একটা সুইচ 'অন' করে দিল।

আর ঠিক কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝিলমের চেহারা ঠিক টুটুলের মতো হয়ে গেল। তারপর শিরস্ত্রাণ দুটো দুজনের মাথা থেকে খুলে নিয়ে টুটুলের প্রতিরূপ ঝিলম বললো—এখন তুমি ওই বুদ্‌বুদ যানে উঠে চোখ বন্ধ করে এক থেকে কুড়ি গোন, তার মধ্যেই ওই 'সময় যান' তোমাকে পৌঁছেদেবে আমার গ্রহে। এই তিনদিনে তুমিও জানতে পারবে আমার গ্রহের শিশুরা কেমন ভাবে থাকে।

টুটুলের ভারী লজ্জা হচ্ছিল। ও আর কিছু না বলে বুদ্‌বুদ যানে উঠে চোখ বন্ধ করে গুনতে শুরু করলো- এক···দুই···তিন···সাত···পনের···সতের— উনিশ ···কুড়ি···।

চোখ খুলতেই অবাক কাণ্ড।

ভারী সুন্দর একটা জায়গায় বুদ্‌বুদ যানটা নেমেছে। চারদিকে কত রঙ-বেরঙের ফুলের গাছ। আর কত শিশু খেলা করছে সেই বাগানে। কয়েকজনকে তো মানুষ বলেই মনে হয় না। একটা বানরছানার মতো দেখতে, অন্যটার শরীর বাদুড়ের মতো কিন্তু মুখটা মানুষের। একটার আবার চারটে হাত, দুটি পা।

শিশুদের মাঝে বাগানের এক বেদীতে বসে আছেন

সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ।

বুদ্‌বুদ যানের দরজা খুলতে টুটুল নামলো মাটিতে। কী সুগন্ধী বাগান, এক ঠাণ্ডা আমেজে টুটুলের মনটা ভরে গেল।

—সুস্বাগতম টুটুল। সেই বৃদ্ধ টুটুলকে অভ্যর্থনা করে বললেন—তুমিই আমাদের গ্রহে সবশেষে এলে। তোমার পৃথিবী গ্রহের হিসেবে তিনটি দিন তুমি আমাদের গ্রহের অতিথি। এরা সবাই তোমার বন্ধু।

ততক্ষণে ওরা সবাই এসে টুটুলকে ঘিরে ধরে নানা গল্প করতে শুরু করে দিয়েছে—এমনকি সেই বানর বাহুড় এবং চারহাতওলা শিশুটিও। ওরা সবাই টুটুলের মতোই এক একটা গ্রহ থেকে এসেছে।

ক্রমে একটা ছোট মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল টুটুলের। তার নাম পুষ্প। সেই গ্রহেরই মেয়ে। দেখতে অনেকটা ঝিলমেরই মতো। টুটুলকে সে নিয়ে গেল তার বাবা-মার কাছে।

টুটুল অবাক হয়ে দেখলো এই গ্রহের শিশুরা কত খুশীতে, কত সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকে। পৃথিবীর মানুষের চেয়ে এই গ্রহের মানুষ অনেক উন্নত। শিশুকে এরা অবহেলা করে না, শিশুদের মিথ্যে কথা বলে না। এরা যা কিছু করে আনন্দের মধ্যে। এখানে সব শিশুই সমান। যার যে বিষয়ে আগ্রহ তাকে প্রথম থেকে তাই শুধু শেখান হয়। তাই সবাই ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করে।

হাসি-খুশী আনন্দে টুটুল কাটিয়ে দিল একটার পর একটা দিন।

তারপর আবার ডাক পড়লো সেই গাছ-গাছালি ভরা বাগানটাতে—যেখানে প্রথম এসে নেমেছিল টুটুল। আগের দিনের মতোই সেই বৃদ্ধ বসেছিলেন বেদীটাতে টুটুলেরই অপেক্ষায়। বললেন—টুটুল, তিনদিন কেটে গেছে, এবার তোমার বাবা-মার কাছে ফেরার পালা। কেমন লাগলো আমাদের গ্রহ?

টুটুল আবেগের আতিশয্যে কিছু বলতে পারলো না, কিন্তু বৃদ্ধ সব বুঝলেন। বললেন—তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি টুটুল, কিন্তু আমাদের ঝিলমকে ফিরিয়ে আনতে হলে, তোমায় না ফিরিয়ে দিয়ে তো উপায় নেই।

একই ভাবে বুদ্বুদ আকৃতির 'সময়-যান'-এ চড়ে নিজের গ্রহে ফিরে এল টুটুল।

সময় নিশুতি রাত। চাঁদটা শুধু উঠতে শুরু করেছে। বুদ্বুদ-যান থেকে ছাদের মেঝেতে পা দিল টুটুল। সামনেই দাঁড়িয়ে টুটুলের প্রতিরূপ ঝিলম।

কিন্তু ওর মুখটা অত শুকনো কেন?

যন্ত্রের সাহায্যে আবার নিজের স্বরূপ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিলম যখন নিজের বুদ্বুদ-যান-এ উঠতে যাচ্ছে, পেছন থেকে টুটুল প্রশ্ন করলো—আমাদের গ্রহের শিশুর জীবন তোমার কেমন লাগলো, বললে না ঝিলম?

একবার থমকে দাঁড়াল ঝিলম। ওর দু'চোখে এক-রাশ বেদনা। অশ্রু ছলছল চোখে বলল—তোমাদের গ্রহের বড়রা শুধু শিশুদের ভবিষ্যতের ভাবনাই ভাবে, শৈশবের ভাবনা ভাবে না টুটুল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস ফেরত মা যখন টুটুলকে একটা নতুন খেলনা এনে দিলেন, টুটুল সেটার দিকে একবারও না তাকিয়ে বার বার করে কেঁদে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললো—এবার থেকে তোমায় আর আমায় ছেড়ে কোথাও যেতে দেব না মা!

টুটুল কি গত রাতে স্বপ্ন দেখেছিল?

——

মুক্তি পেলেন হিউয়েনসাঙ্

রাধারমণ রায়

[হিউয়েনসাঙের বিবরণে আছে, তিনি যখন ভারত-ভ্রমণ সমাপ্ত করে নদীপথে নালন্দা থেকে তাম্রলিপ্ত যাচ্ছিলেন জাহাজে ওঠার জন্য, সে-সময় তিনি সুতানুটির জঙ্গলে এক নরঘাতক কাপালিকের কবলে পড়েছিলেন। পরে তিনি আকস্মিক ভাবে মুক্তিও পেয়েছিলেন। এই তথ্যটিকে ভিত্তি করে নিচের গল্পটি লেখা হলো।]

৮ই কার্তিক, ৫৬৬ শকাব্দ। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিউয়েনসাঙ্ বসে-ছিলেন নৌকার ওপর। সেটা ছিল একটা বড়ো বজরা নৌকা। সঙ্গে তাঁর অনেক সাথী। উপহারও কম নেই। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে দেশে ফিরছেন তিনি। এজন্যে তাঁর মনে যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি বেদনাও হচ্ছে।

বেদনার কারণ বন্ধু-বিচ্ছেদ, প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, তিনি বিদেশী হয়েও ভারতবর্ষের মাটি আর মানুষের সাথে গড়ে তুলেছিলেন অতি নিকট সম্পর্ক। তিনি শুধু সুপণ্ডিতই ছিলেন না, সুবান্ধবও ছিলেন। সমস্ত ভারতবাসীকেই তিনি বন্ধু বলে মনে করতেন। তান্ত্রিক কাপালিকদের পর্যন্ত তিনি অতি আপনজন বলে মনে করতেন। এতে যেমন তাঁর লাভ হয়ে-ছিল, তেমনি ক্ষতিও হয়েছিল। অবন্ধুকে বন্ধু করতে গিয়ে তিনি বেশ কয়েকবার নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিলেন। যেমন, তিনি দেশে ফেরার সময় কালীক্ষেত্রের এক কাপালিকের সাথে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেই গল্পই বলি শোন।

৮ই কার্তিকের বিকেলটা ছিল ঝকঝকে, মনোরম। আকাশ ছিল নির্মল-নীল, নদীর দু'ধারের মাঠ আর বন ছিল মিষ্টি-সবুজ।

সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। হিউয়েনসাঙ্ নৌকার ওপর বসে আকাশ কিংবা সূর্য দেখছিলেন না। তিনি দেখছিলেন সুতানুটির অরণ্যের শোভা। তিনি শুনেছিলেন, হিন্দুতীর্থ কালীক্ষেত্র গঙ্গার পূর্বতীরে সুতানুটির এই অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত। তিনি আরো শুনেছিলেন, কালীক্ষেত্রে আছে কালী-হ্রদ। সেই হ্রদের তীরে এসে পড়েছিল সতীর ডান-পায়ের চারটি আঙুল। দেবাসুর যুদ্ধকালে ব্রহ্মা এই হ্রদের পশ্চিমতীরে একটি উঁচু ঢিবির উপর বসে আদ্যাশক্তির আরাধনা করে এসেছিলেন। অবিশ্যি এ-সবই পুরাণের গল্প। গল্প হলেও হিন্দুরা কিন্তু এসব সত্যি বলেই মনে করে। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপদ-বিপদ উপেক্ষা করে তীর্থযাত্রীরা পুণ্য অর্জনের জন্য দলে দলে আসে এই কালীক্ষেত্রে। কত সাধক, কত কাপালিক এখানে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন সেই আদ্যিকাল থেকে।

হিউয়েনসাঙ্ হঠাৎ নাবিকদের নৌকা বাঁধতে বললেন। নৌকা পাড়ে ভিড়তেই তিনি কাউকে কিছু না বলে নেমে পড়লেন ডাঙ্গায়। তারপর চললেন গভীর অরণ্যের দিকে একা, নির্ভয়ে। কিছু-দূর গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন রক্তাম্বর পরিহিত এক কাপালিককে। তিনি কাপালিকের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে দেবী কালিকার দর্শন প্রার্থনা করলেন।

এই কাপালিক প্রতি অমাবস্যায় কালীপূজোর শেষে নরবলি দিতেন। ৮ই কার্তিকের রাতটাও ছিল অমাবস্যা। কাপালিক ভাবলেন স্বয়ং কালীর ইচ্ছাতেই এই 'নর' উপস্থিত হয়েছেন তাঁর আখড়ায়। তিনি গোড়ায় হিউয়েনসাঙের সাথে নিরীহ ভাবে কথা বললেও পরে স্বমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি শক্ত লতা-দিয়ে বেঁধে ফেললেন হিউয়েনসাঙ্কে। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করলো তাঁরই এক চেলা।

হিউয়েনসাঙ্ কাপালিককে শুধোলেন, 'আপনি আমাকে বাঁধলেন কেন?'

'মা তোমার রক্ত চাইছেন, তাই।' বললেন কাপালিক।

'কোন্ মা?'

'মা কালী। ওই যে ওখানে শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি।'

'উনি আপনার মা?'

'উনি আমার মা, তোমার মা, সবার মা।'

'তাই যদি হবে উনি আমার রক্ত চাইবেন কেন? মা কি কখনো সন্তানের রক্ত চায়?'

'চায়। সন্তান খায় মায়ের রক্ত, মা খায় সন্তানের রক্ত। শিশু মায়ের দুধ খায়, তা জান তো? দুধ হচ্ছে মায়ের রক্ত।'

হিউয়েনসাঙ্ বুঝলেন নৌকা থেকে নেমে এভাবে একা বনের ভিতর আসাটা তাঁর উচিত হয়নি। খুবই হটকারিতা হয়েছে! কাজেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া এখন আর তাঁর সামনে কোনো পথই খোলা নেই!

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হলো। রাত গভীর হলো। অমাবস্যার কালো রাত্রি আরো কালো হলো। দ্বিপ্রহর রাত্রে কাপালিকের কালী পূজা আরম্ভ হলো।

হঠাৎ শোঁ-শোঁ শব্দ। ঝড় উঠলো প্রচণ্ড বেগে। মেঘ জমেছিল সন্ধের পরই, ভারতমহাসাগরে নিম্ন-চাপের দরুন। ঝড় ক্রমশঃ রুদ্র মূর্তি ধারণ করতে লাগলো। বৃষ্টিও নামলো জোরে। ঝড়ের দাপটে গাছপালা ভেঙে চুরমার হতে লাগলো। কাপালিকের পাতার কুটীরটাও গেল উড়ে। একটা বটগাছের নীচে ছিল কুটীরটা। বটগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে পড়তেই চাপা পড়লেন পূজোয় উপবিষ্ট কাপালিক। তিনি শুধু চাপাই পড়লেন না, মারাও পড়লেন সেই সঙ্গে। বরাত জোরে বেঁচে গেলেন হিউয়েনসাঙ্। ডালটা ভেঙ্গে তাঁর সামনেই পড়লো।

একটু বাদেই ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। হিউয়েনসাঙের সাথীরা জ্বলন্ত মশাল হাতে খুঁজতে বেরিয়েছিল তাঁকে। সাথীরা এক সময় এসে উপস্থিত হলো কাপালিকের আখড়ায়। তারা এবার হিউয়েন-সাঙ্কে বাঁধনমুক্ত করলো। তারপর তারা কাপালিকের মৃতদেহের সদ্গতি করলো হিন্দু মতে। পরদিন সূর্য উঠলে হিউয়েনসাঙ্ কালীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে নৌকায় উঠে বসলেন। ভাঁটার টানে নৌকো তরতর্ করে এগিয়ে চললো দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে। তাঁকে এখন যেতে হবে তাম্রলিপ্ত বন্দরে। সেখান থেকে জাহাজে উঠে তাকে রওনা হতে হবে চীনদেশে।

সুতানুটির অরণ্যে হিউয়েনসাঙ্ যে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, দেশেফিরেও তা তিনি ভোলেন নি।

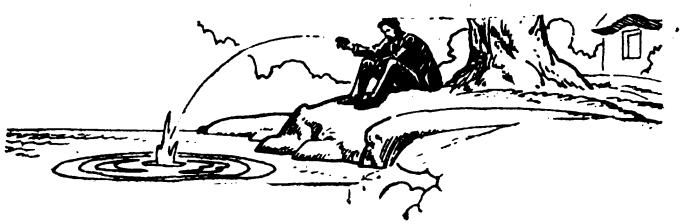

(৫৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আহত হয়েছেন। জেণ্ডাতেই রয়ে গেছেন!

এই কাহিনীটাই সবাই বিশ্বাস করল।

রাজকুমারী ফ্লেভিয়াকে বলা হল তিনি যেন টার্লেনহাইমের দুর্গেই থাকেন।

কিন্তু তিনি শুনবেন কেন?

সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বনের কিনারায় এসে হাজির হলেন।

তখন সেখানে সবে আমার ঘুমভাঙছে।

ওকে দেখে প্রথমে একটি ঝোপের আড়ালে ঝটপট লুকিয়ে পড়ি।

কিন্তু সেই চাষীর মেয়েটি তখনও সেখানে ছিল।

সে দৌড়ে গিয়ে ফ্লেভিয়াকে বলে,

—মহারাজ ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে।

—বাজে কথা। সেনাপতি বলেন। মহারাজ আহত অবস্থায় দুর্গে আছেন।

—মহারাজ আহত ঠিকই, সার, কিন্তু তিনি এখানে সার্জেন্ট ফ্রিট্‌জের সঙ্গে।

ফ্লেভিয়া গাড়ি থেকে নেমে এল ব্যাপারটা দেখতে।

ঠিক তখনই হাজির হলেন স্যাপ্ট।

তিনি বলে উঠলেন—এইসব মেয়েদের কাছে যে-কোন সুদর্শন ভদ্রলোকই হলেন রাজা।

—কিন্তু ইনি যে হুবহু রাজার মত দেখতে।

সেনাপতি ও ফ্লেভিয়া মুখ চাওয়াচায়ি করে!

—কই দেখি। ফ্লেভিয়া বলে।

—তাহলে একা আসুন। স্যাপ্ট বলেন।

ফ্লেভিয়া একাই এসেছিল।

পায়ে হেঁটে এসেছিলেন তাঁরা।

তাকে দেখে দুহাতে মুখ ঢেকেছিলাম আমি।

—এই তো সে। ফ্লেভিয়া চেঁচায়! তোমার কী লেগেছে? তার স্বরে যুগপৎ আনন্দ ও ভয়।

সে মাটিতে আমার পাশে বসে পড়ে।

—এই তো রাজা। মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন, কর্নেল। স্যাপ্ট উত্তর দিলেন না।

সে আমার হাতে হাত রেখে ডকেল—রুডলফ!

—উনি রাজা নন। স্যাপ্ট কোমলকণ্ঠে বলেন,

—এই তো রুডলফ, যাকে আমি ভালোবাসি।

—ওকে আপনি ভালবাসেন ঠিকই, কিন্তু উনি রাজা নন। রাজা জেণ্ডার দুর্গে।

—ফ্লেভিয়া বলে—রুডলফ আমার দিকে তাকাও। এরা এইসব কথা বলছে কেন?

ওর চোখের দিকে তাকাই।

—আমাকে ক্ষমা করুন। সত্যিই আমি রাজা নই।

তার মুখ সাদা হয়ে গেল।

স্যাপ্ট, ফ্রিট্‌জ এবং তারপরে আমার দিকে তাকাল সে। তারপরে অজ্ঞান হয়ে গেল। মাটিতে আলতো করে সযত্নে তাকে শুইয়ে দিই।

এর চেয়ে রুডলফ আমায় মেরে ফেললেই ভালো ছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এখন গভীর রাত। রাজা যে ঘরে বন্দী ছিলেন সেখানেই বিশ্রাম করছি আমি। ফ্রিট্‌জ গোপনে আমায় এখানে নিয়ে এসেছেন।

জোহান এসে খাবার দিয়ে গেছে।

রাজকন্যার সঙ্গে রাজার দেখা হয়েছে এবং তিনি স্যাপ্ট, ফ্রিট্‌জ ও সেনাপতি অনেকক্ষণ কথা বলেছেন।

বাইরে জেণ্ডার বন্দী সম্বন্ধে অনেক গল্পগাথা চলেছে। কেউ বলছে বন্দী মারা গেছেন, কেউ বলছে তিনি জীবিত।

জোহান চলে গেলে ফ্রিট্‌জ্‌ আসেন।

রাজা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তাই আমরা মাইকেলের ঘরে গেলাম।

সেখানেই শয্যাশায়ী আছেন রাজা। ডাক্তার বলেছেন, বেশী কথা না বলতে।

ফ্রিট্‌জ্‌ আর ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

আঙুল থেকে রাজ অঙ্গুরীয় খুলে নিয়ে তাঁকে পরিয়ে দিই।

বলি—এর আমি অসম্মান করি নি, মহারাজ!

রাজা ক্ষীণকণ্ঠে বলেন—বেশী কথা বলতে পারব না। আপনাকে এখানে রাখাই আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু স্যাপ্ট আর ফ্রিট্‌জ বলেন তা। অসম্ভব!

—ঠিকই বলেন! এখানে আমার কাজ শেষ হয়েছে!

—তা হয়েছে! আপনি ছাড়া আর কেউই একাজ করতে পারতেন না। এবার আমি দাড়ি রাখব!

অসুখে চেহারার বদল হবে আমার। কিন্তু চেহারা ছাড়া আর কিছুই বদলায় নি, প্রজারা দেখবে। কী করে রাজার মত রাজা হতে হয় আপনি আমায় শিখিয়েছেন।

রাজা চোখ বন্ধ করলেন।

ক্লান্ত তিনি।

তাঁর হস্ত চুম্বন করলাম।

ফ্রিট্‌জ্‌ আমায় নিয়ে এলেন।

আর কখনো তাঁকে দেখিনি।

কিন্তু ফ্রিট্‌জ্‌ আমায় নিয়ে চললেন অন্যদিকে।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—একজন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সেতুর কাছে আসবেন। ওখানেই থাকব।

—উনি কী চান?

—সে মাথা নাড়ে। জানে না।

—ফ্লেভিয়া সব জানেন?

—হ্যাঁ।

একটা দরজা খুলে ফ্রিট্‌জ্‌ আমায় ঢুকিয়ে দেয়।

সুসজ্জিত কামরা!

ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ফ্লেভিয়া।

উঠে দাঁড়াই।

—দাঁড়িও না, দাঁড়িও না। বসে পড়। তুমি আহত।

ফ্লেভিয়া সস্নেহে আমার কপালে হাত রাখে।

মাপ চাইতে এসেছিলাম। কিন্তু প্রেম নির্বোধকেও অন্তর্দৃষ্টি দেয়।

বলি—আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি।

ফ্লেভিয়া কেন কেঁপে ওঠে?

আমি কী অভিনয় করছি এই ভেবে?

আবার বলি।—তোমাকে ভালবাসি। এ জীবনে আর কোন মেয়ে আসবে না। আমায় ক্ষমা কর!

—তুমি যা করেছ বাধ্য হয়ে করেছ। আমি জানলেও অন্য কথা ভাবতাম না। তোমাকেই আসলে আমি ভালবেসেছি। রাজাকে নয়।

—তোমায় বলতে চেয়েছিলাম। ঘরে ঢুকে পড়েছিল স্যাপ্ট।

—জানি। ওরা আমায় সব বলেছে।

—আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছি।

—না, না, না।

ফ্লেভিয়ার প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে!

—যেতেই হবে। অন্য কেউ দেখে ফেলার আগে—

—যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতাম!

—বোলো না।

ওর কাছ থেকে সরে আসি।

—ঠিক বলেছ রুডলফ। যদি ভালোবাসাই সব কিছু হত, তোমার সঙ্গে কুঁড়ে ঘরেও থাকতাম আমি!

কিন্তু ভালবাসা তো সব নয়। তাই যদি হত তাহলে তুমি রাজাকে বন্দী অবস্থায়ই মরে যেতে দিতে।

—আরেকটু হলে তাই করতাম ফ্লেভিয়া। ফিসফিস করে বলি।

—কিন্তু তোমার সম্মান তোমায় তা করতে দিল না। মেয়েদেরও সম্মান আছে। আমার সম্মান আমার দেশের প্রতি আনুগত্যে। তোমার আংটিটা সবসময় পরে থাকব।

—আমিও তোমারটা।

তারপর ওর কাছে বিদায় নিলাম।

তাড়াতাড়ি সেতু বেয়ে চলে আসি।

স্যাপ্ট আর ফ্রিট্‌জ্‌ দুজনেই সেখানে।

আমায় কিছু জামাকাপড় এনে দিয়েছেন ওঁরা। সেগুলো পরলাম।

পোশাক পরিবর্তনের পরে মুখটা ঢেকে নিলাম ভাল করে।

বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। একটা একটেরে স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হল।

ফ্রিট্‌জ্‌ হঠাৎ আমার হাতে চুমু খেলেন।

—ভগবান সব সময়ে ঠিক লোককেই রাজা করেন না।

স্যাপ্টেরও করমর্দন করতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপল।

—সব ব্যাপারেই শয়তানের হাত আছে। বললেন তিনি।

ট্রেনে চাপলাম।

দু'একজন চেয়ে দেখল।

হয়ত ভাবল কোন সম্মানী লোক গোপনে কোথাও চলেছেন।

নেহাৎই রুডলফ র‍্যাসেনডিল শুনলে তারা হতাশ হত।

যাই হোক, যেই হই, তিনমাস আমি তো রাজা ছিলাম।

যতই ট্রেনটা চলতে লাগল কেবলই কানে বাজতে লাগল এক নারী কণ্ঠে আমারই নাম—রুডলফ, রুডলফ!

এখনও সে ডাক শুনতে পাই।

* * *

এরপরে সামান্যই বলবার আছে।

আল্পস্‌ অঞ্চলে চলে গেলাম সেখান থেকে ভাইকে একটা চিঠি পাঠালাম।

আবার দাড়ি রাখলাম।

ফেরার পথে গাড়িতে আবার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল।

আঁতোয়ানেতও ফিরে এসেছে।

আমার মুখ দিয়ে অবশ্য রুরিটানিয়ার কোন খবরই বার হল না।

বাড়ি ফিরলাম একদিন।

রোজ বিরক্ত হল, কোন বইটই লিখি নি দেখে।

সে বলে—তোমাকে খুঁজতে কত সময় নষ্ট করলাম।

—কেন খুঁজতে গেলে? আমি কী নিজের ভালমন্দ বুঝি না।

—তা নয়। তোমাকে সার জ্যাকবের কথা বলতে চাই। উনি রাজদূত হচ্ছেন। তোমাকে সহকারী করে নিতে চান।

—কোথায় যাচ্ছেন?

—স্ট্রেলসোতে। খুব সুন্দর জায়গা।

—আমি যাব না।

জোর দিয়ে বলি।

—পরে তুমি নিজেও রাজদূত হতে পারতে।

—রাজদূত হতে চাই না।

—হবেও না কোনদিন।

রোজ বিরক্ত হয়ে ওঠে।

হয়তো হব না, কিন্তু রাজদূত হবার বড় বাসনাও নেই। রাজাই তো হয়েছিলাম।

রোজ উঠে গেল।

রবার্ট একটা ছবিওয়ালা পত্রিকা নিয়ে বসল।

স্ট্রেলসোর অভিষেকের একটা ছবি ছাপা হয়েছে তাতে। ছবিটা দেখি। আমার পাশে স্যাপ্ট। সেনাপতি আর ফ্রিট্‌জ্‌ পিছনে দাঁড়িয়ে। কার্ডিনাল, কালো মাইকেল আর রাজকন্যাও আছেন।

আমার ভাই বলে উঠল—অদ্ভুত মিল তো?—একবার আমার দিকে একবার ছবিটার দিকে তাকায় সে।

কিছু বল্লাম না।

অবশ্য রবার্টকে সবরকম গোপন কথাই বলা চলে।

কিন্তু এটাতো আমার কথা নয়।

তাই বল্লাম না।

তারপর থেকে চুপচাপই আছি।

বছরে একবার অবশ্য রুরিটানিয়ার বাইরে ছোট একটা শহরে যাই আমি।

এখানে ফ্রিট্‌জে্‌র সঙ্গে দেখা হয়।

ফ্রিট্‌জে্‌র বিয়ে হয়েছে হেলগার সঙ্গে।

একসপ্তাহ আমরা একসঙ্গে কাটাই।

স্ট্রেলসোর খবর বলে ফ্রিট্‌জ্‌। স্যাপ্ট, রাজা এবং রুপার্টের কথাও বলে।

সন্ধে এলে, অবশেষে, আমরা ফ্লেভিয়ার কথা বলি।

প্রতি বছর ফ্রিট্‌জ্‌ আমায় একটা লাল গোলাপ এনে দেয়।

তার ওপরে একটা কাগজে লেখা থাকে—রুডলফকে ফ্লেভিয়া। চিরকাল।

তাকেও ওইরকম একটা গোলাপ পাঠাই। সে এখন রানী।

এখনও তলোওয়ার খেলা অভ্যেস করি।

মনে হয় কোনদিন হয়তো রুপার্টের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে।

তখন হয়তো সেই জেণ্ডার জঙ্গলের যুদ্ধটা আমরা শেষ করব।

কী হবে কে জানে।

———

কি ভাবছেন?

ছেলেমেয়ের লেখাপড়া?
কন্যার বিবাহ?
অথবা
ভবিষ্যতের নিরাপত্তা?
আজই
ফেবারিট
সঞ্চয় প্রকল্পে
যোগ দিন
সেবা
ও
সঞ্চয়ের
একমাত্র
প্রতীক

ফেবারিট

স্মল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

হেড অফিস:
৮৩, পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০১৬,
ফোন ২৪-৬৬৫৩, ২৪-৭২৮১
২১-৩৫৮৮

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মসচিব
শ্রী এন, দে

হাতখরচের টাকা ইউকোব্যাঙ্কে জমিয়েই আমি এই সাইকেল কিনেছি

বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা
সাইকেল নয়।
এটা আমার নিজেরই।
সাইকেল কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছি
যখন, বাবা বললেন, ইউকোব্যাঙ্কে জমাও,
টাকা বেড়ে যাবে তাড়াতাড়ি।
তাই করলাম।
নিজের টাকা, সুদের টাকা।
বেশিদিন লাগে নি। নিজের সাইকেলে
চড়া, বড়ো আরাম।

U ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে,
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-108/82

Chief Editor : Amitava Sen, C.D· Phone : 22-2770
Published & Edited by Mahindra Basu from 26, Strand Road,
Calcutta-700 001 and Printed by him from Tara Printing Works
100, Arabinda Sarani, Calcutta-700 006.
A. H.W.